দৈনিক বজ্রশক্তি
Dainik Bajroshakti

সংকলন

রেজি: ডিএ ৬২৬৯, সংখ্যা-২৩
বৈশাখ ১৪২৮ । মে ২০২১। রমজান ১৪৪২
৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

সওম (রোজা) নিয়ে বিশেষ আয়োজন

আত্ম সংযম

দাঙ্গা হিংসা
অসহিষ্ণুতা লোভ
প্রতিশোধ

মুক্তির দিশা

পৃ: ২
সওম (রোজা) কী, সওম কার জন্য?

পৃ: ১৪ উম্মতে মোহাম্মদীর জীবনে বিয়ে

পৃ: ২৪
অর্থের বিনিময়ে চারাবি
আলেমগণের অভিমত

সম্পাদকীয়

হুজুগ গুজব মুক্ত বাংলাদেশ কি অধরা

স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির দিনটি আনন্দময় হতে পারতো, হতে পারতো সকলের জন্য উৎসবমুখর একটি দিন। কিন্তু বিধি বাম। নির্দিষ্ট একটি শ্রেণি যারা সবকিছুতে মনগড়া মোড়ক লাগিয়ে ধর্মীয় একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করে নিজেদের অবস্থান জানান দিতে ব্যস্ত, বহুমুখী স্বার্থ উদ্ধারে লিপ্ত। মাদ্রাসার কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিরেট ভালোবাসা, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা- ভক্তি কাজে লাগিয়ে সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করার কাজে লিপ্ত (তাদের এই সমাজপতি হওয়ার প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানানো যেত যদি তা ইসলাম প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠায় কোনো কাজে আসত)। নিজেদের আর্থিক, বৈষয়িক এবং বাঁকা পথে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের হীন চেষ্টায় লিপ্ত থেকে একটি উৎসবমুখর অনন্য উচ্চতার দিনকে সহিংসতার মোড়ক পরিয়ে বেশকিছু হতাহতের ঘটনা ঘটিয়ে, পাকবাহিনীর একাত্তরের ভয়াল ২৫ শে মার্চের তাণ্ডবকে হার মানিয়ে কয়েকটি শহরে তাণ্ডবলীলার ভয়াবহ উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশসহ বিশ্ব যখন করোনা মহামারীর আঘাতে বিপর্যস্ত ঠিক এমন সময় ধর্মজীবীদের আরেক মরণাঘাতে সারাদেশ স্তম্ভিত। বাবরি মসজিদ ভাঙার অন্যতম ক্রীড়নক তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে ভারতের একাধিকবারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশে আগমনকে কেন্দ্র করে ঘটানো হয় এসব তাণ্ডবলীলা। গুজব ছড়িয়ে হুজুগ তুলে দেওয়া হয় 'ইসলাম হেফাজত করতে হবে, এ যুদ্ধে বাঁচলে গাজী, মরলে শহীদ'। বলা বাহুল্য নরেন্দ্র মোদী এ বারই প্রথম বাংলাদেশে এসেছেন, বিষয়টি এমন নয়। কয়েকবছর আগেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি বাংলাদেশ সফর করে গেছেন। তখন কিন্তু এই ধর্মজীবীরা ছিলেন নিশ্চুপ। কিন্তু স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের অনুষ্ঠানে মোদির আগমন নিয়ে কেন এত বিপত্তি। আসল কথা, সরকারের নির্লিপ্ততায় তারা এমন একটা অবস্থান তৈরির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল, তারা যা বলবে সেটা ন্যায় হোক বা অন্যায়, যুক্তিসংগত বা অযৌক্তিক, ইসলামসম্মত বা ইসলামবিরোধী, অসাম্প্রদায়িক বা সাম্প্রদায়িক, যাই হোক না কেন, তারা যা বলবে বাংলাদেশকে তা আজ্ঞা হুজুর বলে মেনে নিতে হবে। দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষলে বা ফ্রাঙ্কেস্টাইন তৈরি করলে তা যে একসময় মহীরুহ তার পালনকর্তাকে গিলে খেয়ে ফেলে সত্যটি ভুলে গিয়েছিল কেউ কেউ। সেটাই মঞ্চস্থ হলো ২৬ থেকে ২৮ শে মার্চ সিংহপুরুষ আলেম নামধারী হুজুররা এখন ভোল পাল্টে ফেলেছেন। মাদ্রাসার কোমলমতি শিক্ষার্থী যত তাড়াতাড়ি বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যে, কোরআন-সুন্নাহ আল্লাহ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দিক নির্দেশনা মোতাবেক চললে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, এসকল ওস্তাদদের মনগড়া ব্যাখ্যা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্যে ইসলাম নেই। সরকারকে শুধু মুখে বললে হবে না, কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে, শুধুমাত্র নাশকতা, জ্বালাও-পোড়াও তাণ্ডবলীলার মদদদাতা ও অংশগ্রহণকারী ছাড়া নিরপরাধ কোনো আলেম হয়রানির শিকার হবে না। মহান মে দিবসে শ্রমিকের আত্মত্যাগ আজও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। মে দিবসে অনেক গালভরা বুলি আমরা শুনি, আমরা আর শুনতে চাই না, এবার বাস্তবায়ন দেখতে চাই।

সূচিপত্র

- *সওম (রোজা) কী, সওম কার জন্য?* ২
- *প্রসঙ্গ সওম: পণ্ডিতদের বাড়াবাড়ি ইসলামকে অপ্রাকৃতিক বানিয়ে ফেলেছে*. ৭
- *সওমের ফরজ, সুন্নত ও অন্যান্য*. ১১
- *উম্মতে মোহাম্মদীর জীবনে বিয়ে*. ১৪
- *ব্যক্তিগত আমলের বেড়াজালে ইসলাম* ২০
- *অর্থের বিনিময়ে তারাবি: আলেমগণের অভিমত* ২৪
- *রমজানের খাদ্যাভ্যাস* ২৮
- *ইসলামের উদ্দেশ্য কী?* ২৯
- *রোজায় পানির ঘাটতিতে ফ্রুট শেক* ৩২

প্রকাশক ও সম্পাদক:
এস এম সামসুল হুদা
১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মানিকগঞ্জ প্রেস, ৪৪ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উপদেষ্টামণ্ডলী:
মসীহ উর রহমান
উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী
রুফায়দাহ পন্নী

প্রচ্ছদ ও লেআউট কম্পোজিশন:
হেলাল উদ্দিন

বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:
২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
০২-৪৭২১৮১১১, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪

বিজ্ঞাপন বিভাগ:
০১৬৩৪-২০৮০৩৯

ওয়েব:
www.bajroshakti.com
facebook.com/dailybajroshakti

ই-মেইল:
bajroshakti@gmail.com

সওম (রোজা) কী, সওম কার জন্য?

মসীহ উর রহমান

সুপ্রিয় পাঠক, সওমের উদ্দেশ্য জানার আগে এটুকু জেনে নেই যে, পবিত্র কোর'আনে উল্লেখিত 'সওম' শব্দটি 'রোজা' শব্দে পরিণত হলো কীভাবে? এ উপমহাদেশে সওম বা সিয়ামের বদলে রোজা শব্দটা ব্যবহারে আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, সওম বললে অনেকে বুঝিই না সওম কী। কোর'আনে কোথাও রোজা শব্দটা নেই কারণ কোর'আন আরবি

ভাষায় আর রোজা ফার্সি অর্থাৎ ইরানি ভাষা। কেবল নামাজ রোজাই নয়, আরও অনেক শব্দ আমরা ব্যবহার করি যা কোর'আনে নেই। যেমন খোদা, বেহেশত, দোজখ, ফেরেশতা, জায়নামাজ, মুসলমান, পয়গম্বর, সিপারা ইত্যাদি। এই ব্যবহার মুসলিম দুনিয়ায় শুধু ইরানে এবং আমাদের এই উপমহাদেশে ছাড়া আর কোথাও নেই। এর কারণ আছে। কারণটা হলো - ইরান দেশটি সমস্তটাই অগ্নি-উপাসক ছিল। প্রচণ্ড শক্তিশালী, অন্যতম বিশ্বশক্তি ইরান ছোট্ট উম্মতে মোহাম্মদীর কাছে সামরিক সংঘর্ষে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে গিয়েছিল। পরাজিত হবার পর প্রায় সমস্ত ইরানি জাতিটি অল্প সময়ের মধ্যে পাইকারিভাবে দীন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। এই ঢালাওভাবে মুসলিম হয়ে যাবার ফলে তারা ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা পূর্ণভাবে বুঝতে সমর্থ হলো না অর্থাৎ তাদের আকিদা সঠিক হলো না। তারা ইসলামে প্রবেশ করল কিন্তু তাদের অগ্নি-উপাসনার অর্থাৎ আগুন পূজার সময়ের বেশ কিছু বিষয় সঙ্গে নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করল। ইরানীরা আগুন উপাসনাকে নামাজ পড়া বলত, সালাহ্-কে তারা নামাজ বলতে শুরু করল, তাদের অগ্নি-উপাসনার ধর্মে উপবাস ছিল, তারা সওমকে রোজা অর্থাৎ উপবাস বলতে লাগল, মুসলিমকে তারা ফার্সি ভাষায় মুসলমান, নবী-রসুলদের পয়গম্বর, জান্নাতকে বেহেশত, জাহান্নামকে দোজখ, মালায়েকদের ফেরেশতা, আল্লাহকে খোদা ইত্যাদিতে ভাষান্তর করে ফেলল। শুধু যে সব ব্যাপার আগুন পূজার ধর্মে ছিল না, সেগুলো স্বভাবতই আরবি শব্দেই রয়ে গেল; যেমন যাকাত, হজ্ব ইত্যাদি। তারপর মুসলিম জাতি যখন ভারতে প্রবেশ করে এখানে রাজত্ব করতে শুরু করল তখন যেহেতু তাদের ভাষা ফার্সি ছিল সেহেতু এই উপমহাদেশে ঐ ফার্সি শব্দগুলোর প্রচলন হয়ে গেল। এক কথায় বলা যায় যে, আরবের ইসলাম পারস্য দেশের ভেতর দিয়ে ভারতে, এই উপমহাদেশে আসার পথে ফার্সি ধর্ম, কৃষ্টি ও ভাষার রং-এ রঙিন হয়ে এলো।

• সওমের আকিদা

ইসলামের যেমন একটা উদ্দেশ্য আছে, তেমনি ইসলামের সকল হুকুম আহকামেরও প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য আছে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ধরুন একটি গাড়ি। গাড়িটির

উদ্দেশ্য কী সবাই জানে- এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গাড়িতে বিভিন্ন যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যেমন ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে শক্তি উৎপাদনের জন্য। ইঞ্জিন চালনার জন্য তেল সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শুধু ইঞ্জিন দিয়ে লক্ষ্য হাসিল হবে না, লাগবে চাকা। চাকা চলার জন্য চেসিস লাগবে। ডানে-বামে ঘোরানোর জন্য লাগবে স্টিয়ারিং হুইল। দেখার জন্য লুকিং গ্লাস। রাতের বেলায় চলার জন্য লাইট। বসার জন্য সিট। এইভাবে বলতে গেলে শত শত যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ একত্র করেই একটি গাড়ি হয়। প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশের আবার উদ্দেশ্য আলাদা।

ঠিক একইভাবে আল্লাহ যে সত্যদীন বা দীনুল হক দান করলেন, কেতাব নাযিল করলেন, নবী-রসুলদেরকে পাঠালেন ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য আছে। আসমান-জমিন, গ্রহ-নক্ষত্র কোনো কিছুই যেমন উদ্দেশ্যহীনভাবে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেননি তেমনি মানুষকেও একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। যে কোনো বিষয়ের উদ্দেশ্য জানাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো আমল করার আগে কাজটি কেন করব এই উদ্দেশ্য জানা প্রত্যেকের জন্য অত্যাবশ্যক। সঠিকভাবে উদ্দেশ্যটা জেনে নেওয়াই হলো আকিদা সঠিক হওয়া। সমস্ত আলেমরা একমত যে আকিদা সহীহ না হলে ঈমানের কোন মূল্য নেই। এই আকিদা হলো কোনো একটা বিষয় সম্বন্ধে সঠিক ও সম্যক ধারণা (Comprehensive Concept, Correct Idea)। ইসলামের একটা বুনিয়াদী বা ফরজ বিষয় হলো সওম বা রোজা। পূর্বের অন্যান্য ধর্মগুলোর মধ্যেও উপবাস ব্রত (Fasting) পালনের বিধান ছিল যা বর্তমানে সঠিকরূপে নেই। ইসলামের বেলাতেও একই ঘটনা ঘটেছে। কাজেই মো'মেনদেরকে অবশ্যই সওমের সঠিক আকিদা জানতে হবে। প্রথমত জানতে হবে সওম বা রোজা কার জন্য।

• সওম কার জন্য?

সওমের নির্দেশ এসেছে একটি মাত্র আয়াতে, সেটা হলো- "হে মো'মেনগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মতো তোমাদের উপরও সওম ফরদ করা হয়েছে, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার (সুরা বাকারা-১৮৩)।" পাঠকগণ খেয়াল করুন, সওমের নির্দেশনাটা কিন্তু মো'মেনদের জন্য, আয়াতটি শুরু হয়েছে 'হে মো'মেনগণ' সম্বোধন দিয়ে। আল্লাহ কিন্তু বলেননি যে হে মানবজাতি, হে বুদ্ধিমানগণ, হে মুসুল্লিগণ ইত্যাদি। তার মানে মো'মেনরা সওম পালন করবে। তাহলে মো'মেন কারা? আল্লাহ সুরা হুজরাতের ১৫তম আয়াতে বলেছেন, "তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও রাসুলের উপর ঈমান আনে, কোনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ মো'মেন।" এই সংজ্ঞা যে পূর্ণ করবে সে মো'মেন। আমরা সংজ্ঞায় ২টি বিষয় পেলাম। এক, আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে মেনে নেওয়া। যে বিষয়ে আল্লাহ ও রসুলের কোনো হুকুম-বিধান, আদেশ-নিষেধ আছে সেখানে আর কারো হুকুম মানা যাবে না। এই কথার উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ও দণ্ডায়মান। তারপর আল্লাহর এই হুকুম-বিধানকে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্যে যিনি আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাবেন, তিনি হবেন মো'মেন। তার জীবন-সম্পদ মানবতার কল্যাণে তিনি উৎসর্গ করবেন। এই মো'মেনের জন্যই হলো সওম, সালাহ, হজ্ব সবকিছু।

ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি যার প্রথমেই হচ্ছে তওহীদ অর্থাৎ কলেমা। তারপরে সালাহ, যাকাত, হজ্ব ও সর্বশেষ হচ্ছে সওম (আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বোখারী)। এখানে প্রথমটি হচ্ছে ঈমান আর বাকি সব আমল। যে ঈমান আনবে তার জন্য আমল। মানুষ জান্নাতে যাবে ঈমান দিয়ে, আমল দিয়ে তার জান্নাতের স্তর নির্ধারিত হবে অর্থাৎ কে কোন স্তরে থাকবে সেটা নির্ভর করবে তার আমলের উপর। এই জন্যই রসুল (সা.) বলেছেন, "যে বললো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেই জান্নাত যাবে (আবু যর গিফারি রা. থেকে বোখারী মুসলিম)। তাহলে এখানে পরিষ্কার দুইটা বিষয় - ঈমান ও আমল। সওম হলো আমল। আর মো'মেনের জন্য এই আমল দরকার।

• মো'মেনের লক্ষ্য অর্জনে সওমের ভূমিকা

সওম (রোজা) শব্দের অর্থ বিরত থাকা অর্থাৎ আত্মসংযম (Self Control)। রমজান মাসে মো'মেন সারাদিন সওম রাখবে অর্থাৎ পানাহার ও জৈবিক চাহিদাপূরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, আত্মাকে করবে শক্তিশালী। সে অপচয় করবে না, মিথ্যা বলবে না, পশুর মতো উদরপূর্তি করবে না। সে হবে নিয়ন্ত্রিত, ত্যাগী, নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গকারী এবং আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে সজাগ। নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে তার মনকে, আত্মাকে শক্তিশালী করবে। প্রশ্ন হতে পারে, মো'মেনের কেন মনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা দরকার? এর উত্তর আল্লাহ দিয়েছেন- যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো (সুরা বাকারা ১৮৩)।

তাকওয়া হলো সাবধানে, সতর্কতার সাথে, দেখে শুনে জীবনের পথ চলা। আল্লাহর হুকুম যেটা সেটা মানা, আর যেটা নিষেধ সেটা পরিহার করা। এটা করতে হলে প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তিনি হলেন মুত্তাকি। আল্লাহর দৃষ্টিতে মো'মেনের মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে এই তাকওয়া (সুরা হুজরাত ১৩)। যিনি প্রতিটি কাজে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ, ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি বিচার বিবেচনা করেন এবং সত্য, ন্যায়, হক ও বৈধপথ অবলম্বন করেন তিনি হলেন মুত্তাকি। যিনি যত বেশি ন্যায়সঙ্গত ও বৈধপন্থা অবলম্বন করবেন তিনি তত বড় মুত্তাকি। সুতরাং সওমের উদ্দেশ্য হলো মো'মেনকে মুত্তাকি করবে। তাকওয়া অর্জনে তাকে সহায়তা করবে। জীবনের চলার পথকে সুন্দর ও মার্জিত করবে। আর তার চূড়ান্ত ফলাফল হবে এই যে, মো'মেনের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়ে যাবে। সেই লক্ষ্য কি আমরা জানি?

নবী করিম (সা.) এর জীবনের লক্ষ্য ছিল- আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান মোতাবেক মানবজাতিকে পরিচালিত করে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এ জন্য এ দীনের নাম হলো ইসলাম, শান্তি। আল্লাহ বলেছেন, তিনি সঠিক পথনির্দেশ (হেদায়াহ) ও সত্যদীনসহ স্বীয় রসুল প্রেরণ করেছেন যেন রসুল (সা.) একে সকল দীনের উপর বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন (সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা সফ ৯)। সেই সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্ব উপায়ে প্রচেষ্টা চালানো তাই প্রত্যেক মো'মেনের জন্যও অবশ্য কর্তব্য, ফরদ। এটাই একজন মো'মেনের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু এই দীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে মো'মেনের অবশ্যই কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গুণ লাগবে। সেই চারিত্রিক, মানসিক, আত্মিক গুণ, বৈশিষ্ট্য (Attributes) এটা যে সে অর্জন করবে কোত্থেকে অর্জন করবে? সেটার জন্য আল্লাহ তাঁর দীনের মধ্যেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রেখেছেন। সেটা হলো সালাহ, সওম, হজ্ব, যাকাত এগুলো। এগুলোর মাধ্যমে তার চরিত্রে বহু ধরনের গুণ অর্জিত হবে। তারপর সে গুণাবলী চরিত্রে ধারণ করে আল্লাহর সত্যদীন পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা করে মানবসমাজ থেকে অন্যায় অশান্তি দূর করতে পারবে, যেটা উম্মতে মোহাম্মদীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

খানিক আগেই গাড়ির উদাহরণ দিলাম। একটি গাড়ির উদ্দেশ্য হচ্ছে তা মানুষকে বহন করে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যাবে। এই গাড়ির প্রতিটি যন্ত্রাংশের (Parts) আবার ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে। চাকার উদ্দেশ্য, পিস্টনের উদ্দেশ্য, সিটের উদ্দেশ্য, স্টিয়ারিং-এর উদ্দেশ্য, ইঞ্জিনের উদ্দেশ্য আলাদা আলাদা হলেও তাদের সবার সম্মিলিত উদ্দেশ্য হচ্ছে গাড়িটির এক স্থান থেকে আরেক স্থানে চলন (Movement)| গাড়িটি যদি অচল হয়, তাহলে এর যন্ত্রাংশগুলো আলাদা আলাদাভাবে যতই ভালো থাকুক লাভ নেই। তেমনি ইসলামের একটি সামগ্রিক উদ্দেশ্য আছে তা হলো - সমাজে শান্তি রাখা। মানব সমাজে যদি শান্তিই না থাকে তখন ইসলামের সব আমলই অর্থহীন। গাড়ির যেমন প্রতিটি যন্ত্রাংশের আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য থাকে তেমনি দীনুল হকের (ইসলাম) অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয়ের আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সবগুলো মিলিয়ে মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। যেমন সালাতের উদ্দেশ্য ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, সময়ানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা, একাগ্রতা ইত্যাদি মো'মেনের চরিত্রে সৃষ্টি, যাকাতের উদ্দেশ্য সমাজে অর্থের সুষম বণ্টন, হজ্বের উদ্দেশ্য মুসলিম উম্মাহর জাতীয় বাৎসরিক সম্মেলন এবং হাশরের দিন আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার আধ্যাত্মিক মহড়া। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ বছরে একবার তাদের জাতীয় সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করবে এবং কেন্দ্রীয় নেতার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমাধান করবে। একইভাবে সওমও মো'মেনের চরিত্রে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা দিয়ে থাকে। কী সেই শিক্ষা সেটা নিয়ে এখন আলোচনা করব।

- **সওম কী চরিত্র দান করে?**

মানুষের নফস ভোগবাদী, সে চায় দুনিয়ার সম্পদ ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে। পক্ষান্তরে সওমের শিক্ষা হচ্ছে ত্যাগ করা, সংযত থাকা, নিজের ভোগবাদী প্রবণতার মুখে লাগাম দেওয়া। মানবতার কল্যাণে কাজ করা, সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা হচ্ছে ত্যাগের বিষয়, যা ভোগের ঠিক উল্টো। এটা করতে নিজেদের জান ও মালকে উৎসর্গ করতে হয়। ত্যাগ করার জন্য চারিত্রিক শক্তি, মানসিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে।

মো'মেন সারা বছর খাবে পরিমিতভাবে যেভাবে আল্লাহর রসুল দেখিয়ে দিয়ে গেছেন এবং সে অপচয় করবে না, পশুর মতো উদরপূর্তি করবে না। সেখানে একটি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। কিন্তু বছরে এক মাস দিনের বেলা নির্দিষ্ট সময়ে সে খাবে না, জৈবিক চাহিদা পূর্ণ করবে না অর্থাৎ নিজের ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করবে, ফলে আত্মা শক্তিশালী হবে, আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে সে সজাগ হবে। এটা করতে গিয়ে আল্লাহর হুকুম মানার জন্য তার যে শারীরিক কষ্ট, মানসিক কষ্ট সহ্য করার

মানসিকতা তৈরি হবে এটা তার জাতীয়, সামষ্টিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হবে। আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে কষ্টদায়ক হলেও সে ভোগবাদী হবে না, পিশাচে পরিণত হবে না, সে নিয়ন্ত্রিত হবে, ত্যাগী হবে। সে আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী হবে না, মান্যকারী হবে। তার ত্যাগের প্রভাবটা পড়বে তার সমাজে। ফলে এমন একটি সমাজ গড়ে উঠবে যেখানে সবাই একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে উৎসাহী, নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়াতে আগ্রহী হবে। তাদের মধ্যে বিরাজ করবে সহযোগিতা, সহমর্মিতা। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে সওমের মূল উদ্দেশ্যটাই হলো আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ। আমরা যদি সালাহকে (নামাজ) সামষ্টিক (Collective) প্রশিক্ষণ মনে করি তাহলে সওম অনেকটা ব্যক্তিগত (Individual) প্রশিক্ষণ।

এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের সমাজে অধিকাংশ মুসলিমই সওম রাখছেন। কিন্তু সওমের যে শিক্ষা তা আমাদের সমাজে কতটুকু প্রতিফলিত হলো। আমরা যদি পৃথিবীতে শুধু মুসলমানদেরকে হিসাবের মধ্যে ধরি যারা আল্লাহ রাসুলকে বিশ্বাস করেন, কেতাব বিশ্বাস করেন, হাশর বিশ্বাস করেন এমন মুসলমান ১৬০ কোটির কম হবে না। আমরা দেখি রোজা যখন আসে মুসলিম বিশ্বে খুব হুলুস্থুল পড়ে যায়। ব্যাপক প্রস্তুতি চলতে থাকে ঘরে ঘরে। রেডিও টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রচারিত হতে থাকে। ইসলামী চিন্তাবিদরা বড় বড় আর্টিকেল লিখতে থাকেন। বিভিন্ন ধরনের কলাম লেখা শুরু হয়। সওমের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য, ইফতারের গুরুত্ব, সেহেরির গুরুত্ব। আবার কেউ কেউ সওয়াবের জন্য রাত জেগে সেহেরির জন্য মানুষকে জাগিয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের সওমটা সঠিক হচ্ছে কিনা, সেটা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার শর্তাবলি পুরন হচ্ছে কি হচ্ছে না এই ব্যাপারে আমাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে।

এটা বোঝার জন্য মুসলিম সমাজে সওমের প্রভাব বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

• সমাজে সওমের কী প্রভাব পড়ছে?

আল্লাহর রসুল বলেছেন, এমন একটা সময় আসবে যখন রোযাদারদের রোযা থেকে ক্ষুধা ও পিপাসা ব্যতীত আর কিছু অর্জিত হবে না। আর অনেক মানুষ রাত জেগে নামাজ আদায় করবে, কিন্তু তাদের রাত জাগাই সার হবে (অর্থাৎ নামাজ কবুল হবে না) (ইবনে মাজাহ, আহমাদ, তাবারানী, দারিমি, মেশকাত)।

এই হাদীসে যাদের কথা বলা হচ্ছে তারা কিন্তু রোজার যথাযথ নিয়ম-কানুন পূর্ণ করে ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা সহ্য করেই রোজা রাখবে, তবু তাদের রোজা আল্লাহর দরবারে কবুল না হবার কারণ কী? এর কারণ আমাদের বাস্তব সমাজেই মিলবে। আজকে আমরা যদি সত্যিকার রোজাদার হতাম, সংযমী হতাম, তাহলে একটা মুসলিমপ্রধান দেশে কীভাবে ১১ মাস খাদ্যদ্রব্যের দাম কমে আর রোজার মাস বাড়ে? রসুলাল্লাহ (সা.) এবং সাহাবী ও তাবে-তাবেয়ীনদের যুগে রমজান মাসে বাজার দর সবচেয়ে মন্দা যেত। পণ্যসামগ্রির চাহিদা থাকতো সবচেয়ে কম। তারা নিজের জন্য ভোগ্যপণ্য কেনাকাটা না করে ঘুরে ঘুরে গরীব দুঃখীদের দান সদকা করতেন। আর বর্তমানে রমজান মাস আসলেই চাল, ডাল, আটা, চিনি, লবণ, পেঁয়াজ, রসুন, তেল এগুলোর মূল্য ধাঁই ধাঁই করে বেড়ে চলে। অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। সংযমের কোনো চিহ্নই থাকে না, অন্য সময়ের চেয়ে খাওয়ার পরিমাণ ও ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেছেন, যারা কুফরী করেছে তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং পশুর মত আহার করে। তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম (সূরা মোহাম্মদ ১২)।

সওমের মাসে যদি সতিকার অর্থে সংযম থাকতো তাহলে মুসলিম বিশ্বে দারিদ্র্য থাকতো না। একমাসের সওমই সমাজকে অনেকাংশে স্বচ্ছল করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারতো। যারা অবস্থাসম্পন্ন তারা যদি সংযমী হতেন যে এই একটি মাস আমরা লোকদেখানো সংযম নয়, সত্যিকারভাবে সংযম করব, তাহলে যতটুকু তারা ব্যয় সংকোচন করছেন সেটা সমাজের মধ্যে উপচে পড়তো। পনেরো কোটি জনসংখ্যার মধ্যে পাঁচ কোটিও যদি সওম (সংযম) করে সেই ভোগ্যবস্তু অন্যকে দান করত তাহলে জাতীয় সম্পদ এমনভাবে উপচে পড়ত নেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। এটা হচ্ছে সওয়মের বাস্তব প্রতিফলন। উদাহরণ যদি অন্যান্য মাসে ভোজ্য তেলের লিটার থাকতো ১০০ টাকা, এই মাসে থাকতো ২০ টাকা। অন্যান্য মাসে গোশত যদি থাকতো ৬০০ টাকা এই মাসে থাকতো ১০০ টাকা। কারণ মানুষ নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে, চাহিদা থাকলেও খাচ্ছে না। সেই নিয়ন্ত্রণের প্রভাব তার শরীরের মধ্যে পড়বে, মনের মধ্যে পড়বে, এতে একদিকে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ হবে, অন্যদিকে সমাজ সমৃদ্ধ হবে। তাহলে প্রতি বছর মুসলিম বিশ্বে রোজা রাখা হচ্ছে, খাদ্যগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের সমাজে অন্যায় অবিচার, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ভয়ানক আকারে বেড়ে চলছে। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে আমাদের সওম হচ্ছে না।

আইয়্যামে জাহেলিয়াতের ভোগবাদী সমাজ ইসলামের ছায়াতলে আসার পর কেমন পরিবর্তিত হয়েছিল সেটা ইতিহাস। যে সমাজে নারীকে ভোগ্যবস্তু মনে করা হতো, সেই সমাজে এমন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে একজন যুবতী নারী একাকী সারা দেহে অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় শত শত মাইল পথ পরিভ্রমণ করত, তার মনে কোনো ক্ষতির আশঙ্কাও জাগ্রত হতো না। মানুষ নিজের উপার্জিত সম্পদ উট বোঝাই করে নিয়ে ঘুরত গ্রহণ করার মতো লোক খুঁজে পেত না। শহরে না পেয়ে মরুভূমির পথে পথে ঘুরত, শেষে মুসাফিরদের সরাইখানাগুলোতে দান করে দিত। সামাজিক অপরাধ এত কমে গিয়েছিল যে আদালতগুলোয় মাসের পর মাস কোনো অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ আসতো না। সেই সোনালি যুগের কথা এখন অনেকের কাছে গল্পের মতো লাগতে পারে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্বে আবু যার গেফারি (রা.) এর গেফার গোত্রের পেশাই ছিল ডাকাতি। সেই আবু যর (রা.) সত্যের পক্ষে আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন। রাস্তায় কেউ সম্পদ হারিয়ে ফেলল খুঁজতে গিয়ে তা অবশ্যই ফেরত পাওয়া যেত। মানুষ সোনা-রূপার অলঙ্কারের দোকান খোলা রেখেই মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ত, কেউ চুরি করত না। মানুষ জীবন গেলেও মিথ্যা বলত না, ওজনে কম দিত না। এই যে শান্তিপূর্ণ অবস্থা কায়েম হয়েছিল এটা কেবল আইন-কানুন দিয়ে হয় নি। মানুষের আত্মায় পরিবর্তন না আনতে পারলে কঠোর আইন দিয়ে মূল্যবোধ সৃষ্টি করা যায় না। যে সমাজের মানুষগুলো কিছুদিন আগেও ছিল চরম অসৎ তাদের আত্মায় এমন পরিবর্তন কী করে সম্ভব হয়েছিল? সেটা হচ্ছে এই সালাত, সওম ইত্যাদি চারিত্রিক প্রশিক্ষণের প্রভাব। সেই নামাজ রোজা তো আজও কম হচ্ছে না, তাহলে এর ফল নেই কেন?

তার কারণ সওম পালনের যে প্রথম শর্ত হচ্ছে তাকে মো'মেন হতে হবে। কিন্তু এই জাতি মো'মেন না। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকওয়া, সত্যমিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় বোধের সৃষ্টি। আজকে অন্যান্য জাতির কথা বাদই দিলাম আমাদের মুসলমানদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধের কোনো চিহ্ন নেই। এই বিষয়গুলা আজকে আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে, ভাবতে হবে। ভাবতে হবে এই জন্য যে আমরা মুসলমান ১৮০ কোটি। একের পর এক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম দেশগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমরা দিনকে দিন মসজিদ বানাচ্ছি, টাইল্‌সের মসজিদ হচ্ছে, এসি হচ্ছে, সোনার গম্বুজ হচ্ছে, আমাদের রোজাদারের কোনো অভাব নাই, হাজীর হজ্বের কমতি নেই, নামাজের কোনো অভাব নাই। এতেই বোঝা যায় আমাদের নামাজ রোজাসহ অন্যান্য আমল কতটুকু গৃহীত হচ্ছে।

সমাজে সওমের আরেকটি প্রভাব পড়া উচিত ছিল যে মানুষ ক্ষুধার্তের কষ্ট অনুধাবন করবে। এটা কি আদৌ পড়ছে? যদি দেখা যায় যে বছরের অন্যান্য সময়গুলোতেও মানুষ এই বিষয়টা উপলব্ধি করে তার খাদ্য ক্ষুধার্তকে দিচ্ছে, প্রতিবেশিকে আহার করাচ্ছে তাহলে বোঝা যেত যে তার রমজানের সওম ফলপ্রসূ হয়েছে অর্থাৎ কবুল হয়েছে। তেমন কোনো নিদর্শন কিন্তু আমাদের সমাজে দেখা যায় না, তবে ব্যতিক্রম দু-চারজন ব্যক্তি থাকতেও পারে।

যে এগারো মাস ঘুষ খায় সে যদি এই একটি মাসে না খায় তাহলে তার একটি বিরাট প্রভাব সমাজে পড়ার কথা। কিন্তু আমরা তো এটা দেখি না, উল্টো এই মাসে অপরাধ আরো বাড়ে। এই মাসে খাদ্যে আরো বেশি বিষ মেশানো হয়। টাকার জন্য মানুষ মানুষকে বিষ খাওয়াচ্ছে, সংযম তো দূরের কথা। এই মাসটিকে ব্যবসায়ীরা বাড়তি উপার্জনের মাস হিসাবে নির্বাচন করে। কথা ছিল সংযম কিন্তু রোজা শুরু হতে না হতেই দামী দামী পোশাক কেনা শুরু হয়। কথা ছিল এ মাসে আমি পোশাক কিনবো গরীব মানুষের জন্য, সে হিন্দু হোক বা মুসলিম। এক কথায় যার বস্ত্র নাই তাকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু কোথায় কী? যেখানে ইরাক-সিরিয়ার মুসলমানরা উদ্বাস্তু হয়ে অভাবের তাড়নায় ইউরোপের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে, শুধু অসহায় নারী নয়, পুরুষরা পর্যন্ত দেহব্যবসায় বাধ্য হচ্ছে সেখানে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে চলে ইফতার আর ঈদের নামে খাদ্য ও সম্পদের বিপুল অপচয়। সওম তাদেরকে কোনো সংযমই শিক্ষা দিচ্ছে না। যেমন সালাহ তাদেরকে কোনো অন্যায় থেকে ফেরাতে পারছে না, ঐক্য-শৃঙ্খলা শিক্ষা দিচ্ছে না, তেমনি সওম পালন করেও চরিত্রে কোনো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয় নি। এভাবেই তাদের সওম তার প্রকৃত সার্থকতা না পেয়ে উপবাসে পর্যবসিত হচ্ছে।

লেখক: আমির, হেযবুত তওহীদ

প্রসঙ্গ সওম

পণ্ডিতদের বাড়াবাড়ি ইসলামকে অপ্রাকৃতিক বানিয়ে ফেলেছে

রিয়াদুল হাসান

ইসলাম বাস্তববাদী জীবন বিধান। তা মানুষকে অপ্রাকৃতিক জীবনচর্চা, বাস্তবতাবিবর্জিত তত্ত্ব ও উপদেশের কারাগারে বন্দী করে রাখতে ইচ্ছুক নয়। বরং এ বাস্তব পৃথিবীতে ঘটনা প্রবাহের আবর্তনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে বসবাস করার নীতি ও পদ্ধতিই ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয়। ইসলাম মানুষকে মালায়েক হতে আদেশ করেনা। হাসি, আনন্দ, বিনোদনবিমুখ যন্ত্রেও পরিণত করতে চায় না। তাকে মনোদৈহিক চাহিদাসম্পন্ন, হাটে বাজারে বিচরণকারী মানুষ মনে করেই তার জন্য বিধান দেয়া হয়েছে।

একজন মানুষের প্রতিটি কথাই হবে 'যিকির', প্রতিটি কথাই হবে ধর্ম সংক্রান্ত, সে চুপ করে থাকলেও দীন সংক্রান্ত গভীর গবেষণায় নিমজ্জিত থাকবে, কানে হেডফোন দিয়ে কেবল কোর'আন তেলাওয়াতই শুনবে, সমস্ত অবসর কেবল মসজিদে অতিবাহিত করবে এমন অবাস্তব জীবনের পথ ইসলাম নির্দেশ করে না। এমনটা আল্লাহ আশাও করেন না, এমন কর্তব্য আল্লাহ মানুষের উপর চাপিয়েও দেননি। ইসলাম মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবগত ভাবধারার ওপর পুরো মাত্রায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন এভাবে যে, পানাহার যেমন তার প্রকৃতির চাহিদা তেমনি আনন্দ-স্ফূর্তি ও সন্তুষ্ট-উৎফুল্লচিত্ত হয়ে থাকা এবং হাসি তামাসা খেলা ইত্যাদিও তার প্রকৃতিগত ভাবধারা হয়ে রয়েছে। এ সত্য কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

• অতি পরহেজগারি ইসলামে নিষিদ্ধ

কোনো কোনো সাহাবী আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য দিতে গিয়ে চারিত্রিক পরিশুদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার বাসনায় সব সময় এবাদতের মধ্যে ডুবে থাকাকেই তাদের কর্তব্য বলে নির্ধারণ করেছিলেন। তারা যাবতীয় বৈষয়িক স্বার্থ, স্বাদ, আনন্দকে পরিহার করে চলতে চেয়েছিলেন। বিষয় হচ্ছে, রসুলাল্লাহ তাঁদের সম্মুখে কেয়ামতের ভয়াবহতা নিয়ে একটি বক্তব্য দিয়েছিলেন যা তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। তারা রসুলাল্লাহর ভাষণের এই অর্থ করেছিলেন যে, মো'মেনদের উচিত নয় কোনোরূপ ক্রীড়া, আনন্দফুর্তিতে অংশ নেওয়া। সম্পূর্ণভবে পরকালমুখী ও পরকালীন ধ্যান-ধারণা ও দায়-দায়িত্ব পূরণে আত্মসমর্পিত হয়ে থাকাই বুঝি স্রষ্টার দাবি।

কিন্তু তাদের এই ভুল ধারণা ভেঙে দিয়েছিলেন আল্লাহর রসুল। তিনি মসজিদে নববীতে সবাইকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন জীবনের সৌন্দর্য্য হচ্ছে ভারসাম্যে। তিনি বললেন, "লোকজনের কী হলো যে তারা নিজেদের জন্য স্ত্রীলোক, আহার্য, সুগন্ধি এবং দুনিয়ার পছন্দনীয় জিনিসগুলো নিষিদ্ধ করেছে? আমি তোমাদেরকে সংসারবিমুখ পাদ্রী এবং সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য হুকুম করতে পারি না। আমার দীনের মধ্যে গোশ্ত (পুষ্টিকর খাদ্য) বর্জন, স্ত্রীলোক ত্যাগ এবং দরবেশ-সন্নাসীদের খান্কা ও আখ্ড়া গ্রহণ করার নিয়ম নেই। এবং সওম আমার উম্মতের এবাদত বন্দেগীর সফর আর জেহাদ হলো তাদের রোহবানিয়াত (সংসার ত্যাগ)।

তিনি আরও বললেন: আল্লাহর এবাদত করো। তাঁর সাথে কাউকেও শরীক কোরো না। হজ্ব ও উমরাহ পালন করো, যাকাত প্রদান করো এবং সিয়াম পালন করো। দীনের উপর দৃঢ়পদ থাকো, আল্লাহ তোমাদেরকে সুদৃঢ় করে দিবেন। তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাশাদ্দুদ -আধিক্য ও বাড়াবাড়ির জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। যখন তারা (দীনের ব্যাপারে) তাদের উপর তাশাদ্দুদ করল তখন আল্লাহও তাদের উপর কঠিন অবস্থা আরোপ করলেন। তাই এখন তারা সাধু-সন্ন্যাসীদের খান্কা ও আখড়ায় বেঁচে আছে মাত্র (বাস্তবজীবনে তাদের দীনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই)।

সার্বভৌমত্ব ও জালালের অধিকারী আল্লাহ ইরশাদ করেন: হে মো'মেনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যা হালাল করেছেন তা তোমরা হারাম কোরো না। সীমালঙ্ঘন কোরো না। এ ধরনের লোককে আল্লাহ পছন্দ করেন না (সুরা মায়েদাহ ৮৭)।

আল্লাহ নাচ-গান, চিত্রাঙ্কন, খেলাধুলা, ভাস্কর্য নির্মাণ কোনো কিছুই হারাম করেননি, কোর'আনে

কোথাও এগুলো হারাম হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই, তথাপি এই জাতির অতিধার্মিকরা নিজেদের উপর এই হারাম-শরিয়াহগুলো আরোপ করেছেন। আল্লাহ নারী পুরুষকে একত্রে শালীনতার সঙ্গে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন আর এরা নারীদেরকে পুরুষদের সামনে আসাই বারণ করে দিয়েছে। এভাবে ইসলামকেও তারা খানকা আর মসজিদের ধর্মে পরিণত করেছে। ইসলাম দিয়ে সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনা করার কোনো অবস্থা আর নেই। তাই ইসলামিক দলগুলো যখন ভোটে দাঁড়ায় তারা আগে থেকেই বলতে থাকে যে আমরা ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি না। এ কথা বলার কারণ, তারা নিজেদের পরিবারের ভোটটাও ঠিকমত পায় না।

যে কথা বলছিলাম, কোনো কোনো সাহাবী ভেবে নিয়েছিলেন যে সব সময় ইবাদতের মধ্যে ডুবে থাকাই তাদের কর্তব্য এবং বৈষয়িক স্বার্থ স্বাদ-আনন্দ পরিহার করে চলাই বাঞ্ছনীয়। ক্রীড়া আনন্দ স্ফূর্তিতে তাদের অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়। সম্পূর্ণভবে পরকালমুখী ও পরকালীন ধ্যান-ধারণা ও দায় দায়িত্ব পরিপূরণে আত্মসমর্পিত হয়ে থাকা একান্তই আবশ্যক।

এ পর্যায়ে মহামান্য সাহাবী হানজালা উসাইদী (রা.) এর একটি কাহিনী উল্লেখযোগ্য। তিনি রসুলে করীম (সা.) এর বিশেষভাবে নিয়োগকৃত একজন লেখক ছিলেন। তিনি নিজের সম্পর্কে নিজেই বলেছেন:

একদিন আবু বকর (রা.) আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন: 'কী অবস্থা হে হানজালা?' বললাম হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন: 'সুবহানাল্লাহ! বল কী?' তখন আমি বললাম: হ্যাঁ, ব্যাপার তো তা-ই। আমরা যখন রসুলে করীম (সা.) এর দরবারে বসা থাকি ও তিনি জান্নাত ও দোযখের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তখন অবস্থা এমন হয়, যেন আমরা তা নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু যখন সেই দরবারের বাইরে চলে আসি, তখন স্ত্রী-পুত্র পরিজন ও কায়কারবারে মন লাগিয়ে দেই, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা তখন অনেকখানিই ভুলে যাই। এ কথা শুনে আবু বকর (রা.) বললেন: আল্লাহর নামে শপথ! আমার অবস্থাও তো ঠিক তদ্রূপ। হানজালা (রা.) বলেন: অতঃপর আমরা দুজন-আমি ও আবু বকর নবী করীমের খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসুল! হানজালা তো মুনাফেক হয়ে গিয়েছে। রসুলে করীম (সা.) বললেন: সে কী রকম? আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা যখন আপনার কাছে থাকি, আপনি জান্নাত জাহান্নামের কথা বলেন, তখন আমরা তা যেন স্পষ্ট দেখতে পাই-এমন অবস্থা হয়। কিন্তু এখান থেকে যখন বের হয়ে যাই, তখন আমরা স্ত্রী-পুত্র পরিজন ও কায়কারবার নিয়ে এত মশগুল হয়ে যাই যে, অনেক কিছুই আমরা ভুলে যাই।

এসব কথা শুনে নবী করীম (সা.) বললেন, "যার হাতে আমার জীবন তাঁর নামে শপথ, তোমরা আমার কাছে থাকা অবস্থায় নিজেদের চিত্তের মধ্যে যে ভাবধারা অনুভব কর, তার মধ্যে যদি তোমরা সব সময়ই থাকতে তাহলে মালায়েকগণ এসে তোমাদের বিছানায় ও পথেঘাটেই তোমাদেও সাথে করমর্দন করত। কিন্তু হে হানজালা! সময়ে সময়ে পার্থক্য রয়েছে। সব সময় এক অবস্থায় থাকা যায় না।- এই কথাটি তিনি পর পর তিন বার বললেন (মুসলিম)।

সুতরাং আধিক্য নয় - স্বাভাবিকতা, অতি পরহেজগারি নয় - আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমানারক্ষা, দরবেশি নয় - ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনই মুসলিমের কর্তব্য। আল্লাহর রসুল বলেছেন, "তোমাদের উপর তোমাদের নফ্সের হক রয়েছে। নফল সওম রাখো এবং (কোনো কোনো সময়) তা থেকে বিরত থাকো। রাতের বেলা (কিছু সময়) তাহাজ্জুদের সালাহ কায়েমে করো এবং (কিছু সময়) ঘুমাও। আমি তাহাজ্জুদের সালাহ কায়েম করি এবং ঘুমাইও। কোনো কোনো সময় সওম রাখি। আবার কোনো কোনো সময় সওম ত্যাগও কারি। গোশত খাই, চর্বিও খেয়ে থাকি। স্ত্রীদের নিকটও যাই। (শোনো!) যে আমার সুন্নাহ–তরিকা ত্যাগ করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

রসুলাল্লাহর জীবনী ও হাদিস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কাউকে দ্বীনের কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি করতে দেখলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কারণ দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করার পরিণতি জাতির মধ্যে মতভেদ-অনৈক্য সৃষ্টি হওয়া এবং যে উদ্দেশ্যে জাতি গঠিত হয়েছে সেই উদ্দেশ্য অর্জন হওয়ার পূর্বেই জাতি ধ্বংস হয়ে যাওয়া- এ কথা আল্লাহর রসুল ভালোভাবেই জানতেন। তাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে অপরাজেয় জাতি তথা উম্মতে মোহাম্মদী সৃষ্টি করলেন তিনি, সেই জাতি বিনাশী কর্মকাণ্ড তাঁর সামনে যখনই ঘটেছে তিনি যৌক্তিক কারণেই অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছেন।

একদিন আল্লাহর রসুলকে (সা.) জানানো হলো যে কিছু আরব সওম রাখা অবস্থায় স্ত্রীদের চুম্বন করেন না এবং রমজান মাসে সফরে বের হলেও সওম রাখেন। শুনে ক্রোধে বিশ্বনবীর (সা.) মুখ-চোখ লাল হয়ে গেলো এবং তিনি মসজিদে যেয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর

হামদ বলার পর বললেন-সেই সব লোকদের কী দশা হবে যারা আমি নিজে যা করি তা থেকে তাদের বিরত রেখেছে? আল্লাহর কসম তাদের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশি জানি এবং বেশি ভয় করি (হাদিস-আয়েশা (রা.) থেকে বোখারী, মুশলিম, মেশকাত)।

বস্তুত সফররত অবস্থায় সওম রাখার কষ্টকর অবস্থা থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য আল্লাহ সওম রাখতে নিষেধ করেছেন। এটা বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত। কিন্তু আল্লাহর রসুল দেখলেন, কিছু লোক সওমকে নিয়ে এতই বাড়াবাড়ি করছে যে, বাড়াবাড়ির আতিশয্যে সফরেও কষ্ট করে সওম রাখা শুরু করেছে, যা এই দ্বীনের ভারসাম্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। সুতরাং তিনি কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করে জাতিকে সতর্ক করে দিলেন এবং বিশ্বনবীর (সা.) ঐ ভর্ৎসনা শুনে তারা আবার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনলেন।

একই ধরনের ঘটনা আরেকদিন ঘটল নামাজের ক্ষেত্রে। একদিন একজন লোক এসে আল্লাহর রসুলের (সা.) কাছে অভিযোগ করলেন যে ওমুক লোক নামাজ লম্বা করে পড়ান, কাজেই তার (পড়ানো) জামাতে আমি যোগ দিতে পারি না। শুনে তিনি (সা.) এত রাগান্বিত হয়ে গেলেন যে -বর্ণনাকারী আবু মাসউদ (রা.) বলছেন যে- আমরা তাকে এত রাগতে আর কখনও দেখি নি (হাদিস- আবু মাসউদ (রা.) থেকে বোখারী)। এখানেও রাগান্বিত হবার একই কারণ- বাড়াবাড়ি! সহজ-সরল বিধানকে জটিল ও কষ্টসাধ্য করে ফেলা!

ইতিহাসে পাই, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ে মাসলা জানতে চাইলে বিশ্বনবী (সা.) প্রথমে তা বলে দিতেন। কিন্তু কেউ যদি আরও একটু খুঁটিয়ে জানতে চাইতো তাহলেই তিনি রেগে যেতেন। কারণ তিনি জানতেন ঐ কাজ করেই অর্থাৎ অতি বিশ্লেষণ ও ফতওয়াবাজী করেই তার আগের নবীদের জাতিগুলো সহজ-সরল দ্বীনকে জটিল ও দুর্বোধ্য করে ফেলে ধ্বংস হয়ে গেছে।

কাজেই আল্লাহ যেটুকু বলেছেন ও আল্লাহর রসুল যেভাবে করেছেন, আমাদের উচিত কেবল সেভাবেই আমল করা, বাড়াবাড়ি না করে ফেলা, দ্বীনকে জটিল করে না ফেলা। মনে রাখতে হবে, ইসলামের কোনো আমলই মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়, মানুষের উপকারের জন্যই।

একদিন এক ব্যক্তি নবীর (সা.) নিকট এসে অনুতাপের সঙ্গে বলল, 'এই বদ-নসিব ধ্বংস হয়েছে।' নবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কী হয়েছে?'

- আমি সওম থাকা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি।

- তোমার কি একজন ক্রীতদাস মুক্ত করার ক্ষমতা আছে?

- না;

- ২ মাস সওম থাকতে পারবে?

- না।

- ৬০ জন গরিবকে খাওয়াতে পারবে?

- না।

এমন সময় এক লোক বড় পাত্রভরা খেজুর নিয়ে আসলো। তখন নবী (সা.) ঐ ব্যক্তিকে বললেন, 'ঐ খেজুর নিয়ে যাও এবং স্বীয় গোনাহর কাফফারা হিসেবে সদকা দাও।' সে বলল, এটা কি এমন লোককে দেব যে আমার চেয়ে অধিক গরিব? আমি কসম করে বলছি, আমার মতো গরিব এ এলাকায় আর কেউ নেই।'

তিনি এ কথা শুনে স্বভাবগত মৃদু হাসির চেয়ে একটু অধিক হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি তোমার পরিবারবর্গকেই খেতে দাও। (আয়েশা রা. থেকে বোখারী, ২য় খণ্ড-, ৮ম সংস্করণ; আ. হক,পৃ: ১৭৫)।

এ থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? এক কথায় দ্বীনের সরলতার শিক্ষা পাই।

আল্লাহ মানুষকে কষ্ট দিতে চান না, পরিশুদ্ধ করতে চান। সওম না রাখার জন্য তিনি কাউকে জাহান্নামে দিবেন বা শাস্তি দিবেন এমন কথা কোরআনে কোথাও নেই। তবে মো'মেন সওম (সংযম সাধনা) না রাখলে তার আত্মিক অবনতি হবে, তার কাঙ্ক্ষিত চারিত্রিক গুণাবলী অর্জিত হবে না, সে স্বার্থপর হবে। সমাজের মানুষগুলো সমমর্মিতা, ত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হবে না। ফলে সমাজ শান্তিদায়ক না হয়ে অশান্তিতে পূর্ণ থাকবে। কাজেই মো'মেনের কল্যাণের জন্যই সওমের নির্দেশ। কিন্তু বাড়াবাড়ির কারণে এই কল্যাণকর আমলটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

হাদিসটি থেকে আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে সওম না রাখতে পারার কাফফারা বা ফিদিয়া এমনভাবে ধার্য করা যাতে সমাজ উপকৃত হয়, দারিদ্র্য দূর হয়। যেমন- দাসমুক্ত করা, দরিদ্র্যকে খাওয়ানো, সদকা দেওয়া ইত্যাদি। রমজান মাসে সদকা বা ফেতরা প্রদান করাও গুরুত্বপূর্ণ আমল যা মানুষের উপকারে আসে। এভাবে বিচার করলে দেখা যাবে ইসলামের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়ন।

বর্তমানের বিকৃত ইসলাম মানুষকে অতি মুসলিম হতে পীড়াপীড়ি করে অথচ পৃথিবীতে কোথাও আল্লাহর সার্বভৌমত্বই নেই, আল্লাহর হুকুম কোথাও শাসনকার্য

চলে না সেটা এই বিকৃত ইসলামের ধারকবাহকদের নজরেও পড়ে না।

আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন এবং আল্লাহর রসুলও বিদায় হজের ভাষণে দীন, জীবনব্যবস্থা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে মাসলাহ জানতে চাইলে বিশ্বনবী (দ.) প্রথমে তা বলে দিতেন। কিন্তু কেউ যদি আরও একটু খুঁটিয়ে জানতে চাইতো তাহলেই তিনি রেগে যেতেন। একদিন একজন পথে পড়ে থাকা জিনিসপত্র কি করা হবে এ ব্যাপারে রসুলাল্লাহর (দ.) কাছে মাসলাহ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তার জবাব দিয়ে দিলেন। ঐ লোকটি যেই জিজ্ঞাসা করলেন যে যদি হারানো উট পাওয়া যায় তবে তার কি মাসলাহ? অমনি সেই জিতেন্দ্রীয় মহামানব এমন রেগে গেলেন যে তার পবিত্র মুখ লাল টকটকে হয়ে গেলো (হাদীস-যায়েদ এবনে খালেদ জুহানী (রা.) থেকে বুখারী)।

কিন্তু তার অত ক্রোধেও অত নিষেধেও কোন কাজ হয় নি। তাঁর জাতিটিও ঠিক পূর্ববর্তী নবীদের (আ.) জাতিগুলির মত দীন নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে অতি মুসলিম হয়ে মাসলা-মাসায়েলের তর্ক তুলে বিভেদ সৃষ্টি করে হতবল, শক্তিহীন হয়ে শত্রুর কাছে পরাজিত হয়ে তাদের গোলামে পরিণত হয়েছে। আজও আমাদের আলেম সমাজ মতভেদে লিপ্ত আছেন অতি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে। তার কয়েকটি উদাহরণ দিই:

১. জানাজার নামাজ পড়ার পর বা পাঞ্জেগানা নামাজের পর মোনাজাত করা যাবে কি যাবে না?
২. নবীজি মাটির তৈরি নাকি নূরের তৈরি?
৩. আল্লাহ সাকার নাকি নিরাকার?
৪. নবীজির ছায়া পড়ত নাকি পড়ত না?
৫. মেরাজ কি সশরীরে নাকি স্বপ্নযোগে?
৬. মিলাদে দরুদ কি দাঁড়িয়ে হবে নাকি বসে হবে?
৭. আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নাকি আরশে সমাসীন?
৮. রাফুলইয়াদাইন হবে কি হবে না?
৯. বেতেরের নামাজ ৩ রাকাত নাকি ১ রাকাত?
১০. তারাবি ৮ রাকাত নাকি ২০ রাকাত?
১১. নেকাব বাধ্যতামূলক নাকি ঐচ্ছিক?
১২. এমাম সুরা ফাতিহা পড়ার পর মুক্তাদিরা আমিন জোরে নাকি আস্তে বলবেন?
১৩. ঈদের নামাজে ও জানাজার নামাজে কয় তাকবির হবে?
১৪. টাই বাঁধা জায়েজ নাকি নাজায়েজ?
১৫. দোয়াল্লিন হবে নাকি জোয়াল্লিন হবে?
১৬. সালাতের তাশাহুদ পড়ার সময় তর্জনি উঠবে নাকি উঠবে না?
১৭. পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা যাবে কি যাবে না?
১৮. পানি বসে খেতে হবে নাকি দাঁড়িয়ে খাওয়া জায়েজ?
১৯. দাড়ি রাখা সুন্নত নাকি ওয়াজিব?
২০. এমামের পেছনে মুক্তাদিরা কি মনে মনে সুরা ফাতিহা পড়বেন নাকি পড়বেন না?
২১. মাজহাব মানা ফরজ নাকি নিষিদ্ধ?
২২. নবীজির ছায়া পড়ত নাকি পড়ত না, তাঁর প্রশ্রাব পায়খানা পবিত্র নাকি অপবিত্র, তাঁর ঘামে সুগন্ধ ছিল নাকি ছিল না?
২৪. নবীজি হাজির নাজির কিনা, হায়াতুন্নবী কিনা, গায়েব জানেন কিনা?
২৫, পাগড়ির রং কী হবে, টুপি কী আকৃতির হবে, দাড়ি কতটুকু হবে?
২৬. ইফতার কি মাগরেবের আযানের সঙ্গে সঙ্গে হবে নাকি চারিদিক অন্ধকার হওয়ার পর হবে?
২৭. নূরে মোহাম্মদী আগে সৃষ্টি হয়েছে নাকি মহাবিশ্ব?
২৮. শবে বরাত, কুলখানী ইত্যাদি জায়েজ নাকি বেদাত?
২৯. খোতবা আরবিতে পড়তে হবে নাকি বাংলায় পড়া যাবে?
৩০. মেয়ে ও ছেলেদের নামাজ একই রকম নাকি ভিন্ন?
৩১. নামাজে হাত কোথায় বাঁধা হবে, বুকে নাকি নাভির নিচে?
৩২. মাইকে আযান দেওয়া যাবে কিনা, ডাইনিং টেবিলে খাওয়া যাবে কিনা?
৩৩. জুম্মার দিন সানি আজান মসজিদের ভিতরে হবে না বাহিরে হবে?
৩৪. আল্লাহর রসুল এন্তেকাল করেছেন নাকি এন্তেকাল করবেন?

এর একটির সঙ্গেও দীনের বুনিয়াদি বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। এসব বিষয়বস্তু জাতির মধ্যে কেবল বিভক্তিই সৃষ্টি করে যাচ্ছে। আজ যদি রসুলাল্লাহ থাকতেন তাহলে তাঁর উম্মাহর আলেম দাবিদারদের এই মূর্খতাসুলভ ও জাতিবিনাশী কর্মকাণ্ডকে তিনি নিঃসন্দেহে কঠোরহস্তে দমন করতেন।

লেখক: সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

সওমের ফরজ, সুন্নত ও অন্যান্য

সম্পাদনা: জিনাত ফেরদাউস তাবাসসুম

আমরা ফার্সি ভাষায় রোজা শব্দটি ব্যবহার করলেও আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেটা হলো সওম। যার অর্থ হলো আত্মসংযম, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, বিরত রাখা। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত নবী-রসুলগণ সকলেই সওম বা রোজা পালন করেছেন। যদিও ধরন ও প্রক্রিয়াগতভাবে স্থান-কাল-পাত্রভেদে সওমের নিয়ম-কানুনে পরিবর্তন এসেছে। এমনকি ইসলামের শেষ সংস্করণেও, বিশ্বনবীর মদীনায় হিজরতের পূর্বে সওমের বিধান বর্তমানের মত ছিল না।

ইবনে কাসীর বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিন দিন সওম রাখার বিধান ছিল। পরে রমজানের সওম ফরজ হলে তা রহিত হয়ে যায়। হযরত মুসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং তাদের উম্মতগণও সওম পালন করেছেন। এছাড়াও প্রাচীন মিসরীয় ধর্ম, গ্রীক ও পারসিক ধর্মেও সওম বা রোজার উল্লেখ পাওয়া যায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক, ইসলামী শরিয়তে কাদের উপর সওম ফরজ-

- **সওম যাদের উপর ফরজঃ**

ইসলামী শরিয়তে রমজানের সওম ফরজ হওয়ার শর্ত হলো:

- **১. মুসলমান হওয়া,**
- **২. সজ্ঞানে থাকা,**
- **৩. উন্মাদ বা পাগল না হওয়া,**
- **৪. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।**

অর্থাৎ ওযরবিহীন প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর রমজান মাসে সওম পালন ফরজ। এই মাস প্রসঙ্গে আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলেন, "রমযান মাসই হল সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোর'আন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে সওম রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।" (বাকারা: ১৮৫)

উপরোক্ত আয়াতে প্রতীয়মান হয়, রমজান মাসে প্রত্যেক মো'মেন নর-নারীর উপর সওম ফরজ হলেও কিছু পরিস্থিতিতে সওম ছেড়ে দেওয়ার অবকাশও আল্লাহ দিয়েছেন। সেগুলো নিম্নোরূপ:

- **সওম যাদের উপর ফরজ নয়**

১. অসুস্থ হলে: অসুস্থ ব্যক্তির জন্য সওম না রাখার অবকাশ আছে। ইরশাদ হয়েছে, ''তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে অন্য সময় 'এই সংখ্যা' পূরণ করতে হবে।" (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৪)

২. বার্ধক্য: ইসলামী শরিয়ত বলে, অতিশয় বৃদ্ধ নারী ও পুরুষের যদি সওম রাখার শারীরিক সামর্থ্য না থাকে, তবে তাদের না রাখার অবকাশ রয়েছে। পবিত্র কোর'আনে বলা হয়েছে, "সওমের কারণে যাদের খুব বেশি কষ্ট হয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদিয়াস্বরূপ একজন অভাবগ্রস্থকে খাদ্য দান করা।' (বাকারা: ১৮৪)

৩. গর্ভধারণ: গর্ভবতী নারী যদি নিজের ও সন্তানের ব্যাপারে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা করেন, তবে তার জন্য সওম না রাখার অবকাশ রয়েছে। রসুলাল্লাহ (সা.) বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুসাফিরের জন্য সওম ও অর্ধেক নামাজ ছাড় দিয়েছেন এবং গর্ভবতী ও সন্তানদানকারী নারীর জন্য সওমের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছেন।" (সুনানে নাসায়ি: ২৩১৫)

৪. সফর: সফররত ব্যক্তির জন্য রমজানের সওম না রাখার অবকাশ আছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে অন্য সময় 'এই সংখ্যা' পূরণ করতে হবে।" (বাকারা: ১৮৪)

৫. অনিবার্য কারণে: বিশেষ প্রয়োজন পূরণ ও আপতিত বিপদের হাত থেকে বাঁচতে কখনো কখনো সওম না রাখার অবকাশ আছে। যেমন ডুবে যাওয়া বা আগুনে পোড়া ব্যক্তির চিকিৎসা সওম ভঙ্গ না করলে করা সম্ভব হয় না। তবে এমন ব্যক্তিও পরবর্তী সময়ে কাজা আদায় করে নিবে।

- **সেহরী খাওয়ার ফযীলত:**

নবী করিম (সা.) বলেছেন, "হে, ঈমানদারগণ! তোমরা সেহরী খাও। কেননা সেহরীর প্রতি লোকমার

পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা এক বছর এবাদতের সাওয়াব দান করবেন।"

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, "হে মো'মেনগণ! তোমরা (রমজানের শেষ রাতে) সেহরী খাও। যেহেতু এ পানাহারের কোনো

হিসাব হবে না।"

আর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি সেহরী খাওয়া হতে বিরত থাকবে, তার স্বভাব-চরিত্র ইহুদীদের ন্যায় হয়ে যাবে। তবে কম করে হলেও দু'এক লোকমা সেহরী খাবে। যেহেতু এতেও অসংখ্য সাওয়াব লাভ হবে।

• ইফতারির ফযীলত

ইফতার অর্থ সওম ভঙ্গ করা। ভোর থেকে সারা দিন 'সওম' পালন শেষে সূর্যাস্তের পর প্রথম যে পানাহারের মাধ্যমে সওম ভঙ্গ করা হয়, তাকে 'ইফতার' বলে।

ইফতারের সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা উত্তম।

মহানবী (সা.) বলেছেন, রোজাদারের জন্য দু'টি খুশি; একটি ইফতারের সময়, অপরটি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় (মুসলিম)। আল্লাহ কোরআনে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত সওম পূর্ণ কর। (সুরা বাকারা ১৮৭) এই আদেশ পালনের আনন্দ প্রকাশিত হয় ইফতারের মাধ্যমে।

• ইফতারের সুন্নত

খেজুর বা খুরমা দিয়ে ইফতার করা সর্বাপেক্ষা উত্তম; যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে যেকোনো মিষ্টিজাতীয় বস্তু দিয়ে ইফতার করা ভালো। আর যদি এটাও সম্ভব না হয় তাহলে যেকোনো হালাল খাদ্য দিয়ে, এমনকি শুধু পানি দিয়েও ইফতার করা যায়। রাসুলে করিম (সা.) বলেন, "তোমরা যখন ইফতার করো, তখন খুরমা বা খেজুর দিয়ে ইফতার করো, কেননা খুরমা বা খেজুরের মধ্যে বরকত রয়েছে, আর যদি খুরমা বা খেজুর পাওয়া না যায়, তাহলে পানি দিয়ে ইফতার করা ভালো, কেননা পানি পবিত্রকারী।"

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি রমজান মাসে কোনো রোজাদার ব্যক্তিকে ইফতার করায় তবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন হতে আল্লাহর রহমতে নাজাত পাবে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রমজান মাসে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো রোযাদারকে খেজুর কিংবা মিষ্টি, শরবত অথবা অল্প পরিমাণ দুধ দ্বারাও ইফতারী করায়, তবে তার জন্য রমযান মাসের প্রথম অংশে আল্লাহর রহমত ও করুণা, দ্বিতীয় অংশে ক্ষমা এবং তৃতীয় অংশে জাহান্নামের আজাব হতে নাজাতের সুসংবাদ রয়েছে।

• সওম ভঙ্গের কারণসমূহ:

১. ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে।
২. স্ত্রী সহবাস করলে।
৩. কুলি করার সময় হলকের নিচে পানি চলে গেলে।
৪. ইচ্ছকৃত মুখভরে বমি করলে।
৫. নাকে বা কানে ওষধ বা তেল প্রবেশ করালে।
৬. জবরদস্তি করে কেউ সওম ভাঙ্গালে।
৭.ইনজেকশান বা স্যালাইনের মাধ্যমে ওষুধ গ্রহণ করলে।
৮. কংকর পাথর বা ফলের বিচি গিলে ফেললে।
৯. সূর্যাস্তের আগেই ইফতার করে ফেললে।
১০. পুরা রমজান মাস রোজার নিয়ত না করলে।
১১. দাঁত হতে ছোলা পরিমান খাদ্য-দ্রব্য গিলে ফেললে।
১২. ধূমপান করা, ইচ্ছাকৃত লোবান বা আগরবাতি জ্বালিয়ে ধোঁয়া গ্রহণ করলে।
১৩. মুখভর্তি বমি গিলে ফেললে।

১৪. রাত্রি আছে মনে করে সোবহে সাদিকের পরও পানাহার করলে।

১৫. মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে পড়ে সুবহে সাদিকের পর নিদ্রা হতে জাগরিত হলে।

- **সওমের বিকল্প ফিদইয়া কী? কেন?**

ফিদইয়া আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো বিনিময়, মূল্য, পণ বা মুক্তিপণ, সম্মানজনক প্রতিদান। যারা সওম পালনে সক্ষম নয়, তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ফিদইয়ার বিধান রয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সিয়াম বা সওম নির্দিষ্ট কয়েক দিন (এক মাস মাত্র), তবে তোমাদের যারা পীড়িত থাকবে বা ভ্রমণে থাকবে তবে অন্য সময়ে তা এর সমপরিমাণ সংখ্যায় পূর্ণ করবে। আর যাদের সওম পালনের সামর্থ্য নেই, তারা এর পরিবর্তে ফিদইয়া দেবে একজন মিসকিনের খাবার। অনন্তর যে ব্যক্তি অধিক দান করবে তবে তা তার জন্য অতি উত্তম। আর যদি তোমরা পুনরায় সওম পালন কর, তবে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম।’ (সুরা বাকারা ১৮৪) অর্থাৎ ফিদইয়া হলো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ানো ও অর্থ-সম্পদ দানের মাধ্যমে সহযোগিতা করা। যারা শারীরিকভাবে এতটাই দুর্বল যে, রমজান মাসে তো বটেই, পরবর্তীতেও সওম রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, শুধুমাত্র তাদের জন্যই ফিদইয়ার বিধান। যাদের পরবর্তীতে সওম রাখার সামর্থ্য আছে, তারা রমজানের পরিবর্তে পরবর্তীতে কাজা সওম আদায় করে নিবে। ফিদইয়া তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

- **সাদাকাতুল ফিতর কী? কেন?**

ফিতরা বা সদকাতুল ফিতর হলো সেই নির্ধারিত সদকা, যা ঈদের নামাজের আগে প্রদান করতে হয়। একে জাকাতুল ফিতরও বলা হয়। ঈদের দিন সকালবেলায় যিনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের (সাড়ে সাত ভরি সোনা বা সাড়ে বাহান্ন ভরি রুপা বা সমমূল্যের ব্যবসাপণ্যের) মালিক থাকবেন, তাঁর নিজের ও পরিবারের ছোট-বড় সবার পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা তাঁর প্রতি ওয়াজিব।

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বলেন, নবী (সা.) এর জমানায় আমরা সদকাতুল ফিতর দিতাম এক সা (সাড়ে তিন কেজি প্রায়) খাদ্যবস্তু। তিনি বলেন, তখন আমাদের খাদ্য ছিল যব, কিশমিশ, পনির ও খেজুর। (বুখারি, খন্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ২০৪)। তিনি আরও বলেনঃ আমরা সদকাতুল ফিতর আদায় করতাম এক সা খাদ্যবস্তু, যেমনঃ এক সা যব, এক সা খেজুর, এক সা পনির, এক সা কিশমিশ। (বুখারি, খন্ড ১, পৃষ্ঠাঃ ২০৫)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ‘তাই উত্তম, দাতার নিকট যা সর্বোৎকৃষ্ট এবং যার মূল্যমান সবচেয়ে বেশি।’ (বুখারি, খন্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ১৮৮)। ইমাম আবু হানিফার মতে, অধিক মূল্যের দ্রব্য দ্বারা ফিতরা আদায় করা উত্তম; অর্থাৎ যা দ্বারা আদায় করলে গরিবদের বেশি উপকার হয়, সেটাই উত্তম ফিতরা।

আল্লাহ আমাদের সকলকে রমজান মাসে সওমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝে এর পূর্ণ হক আদায়ের তওফিক দান করুন।

সদস্য, হেযবুত তওহীদ

ভিজিট করুন

facebook.com/
emamht

উম্মতে মোহাম্মদীর জীবনে বিয়ে

মো. আসাদ আলী

নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিয়েই একমাত্র বৈধ উপায়, একমাত্র বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা। বিয়ে ছাড়া অন্য কোনোভাবে নারী পুরুষের মিলন ও সম্পর্ক স্থাপন সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিয়ে হচ্ছে পুরুষ ও নারীর মাঝে সামাজিক পরিবেশে ও সমর্থনে অনুষ্ঠিত এমন এক সম্পর্ক স্থাপন, যার ফলে দুজনে একত্রে বসবাস ও পরস্পরের দাম্পত্য সম্পর্ক ও সন্তান উৎপাদন সম্পর্ণরূপে বৈধ হয়ে যায় এবং পরস্পরের উপর অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য অবশ্য পালনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

• ইসলামে বিয়ের বিধান

বিয়ের ব্যাপারে পবিত্র কোর'আনে অনেকগুলো আয়াত রয়েছে, যেগুলো মো'মেনদের জন্য সীমারেখা হিসেবে বিবেচ্য। প্রথমেই সাধারণ একটি ঘোষণা, 'তোমাদের মধ্যে যারা আইয়্যিম, তাদেরকে বিয়ে দাও।' (নুর: ৩২) অনেকে আইয়্যিম শব্দের অনুবাদ করেন "অবিবাহিত" শব্দ দিয়ে। কিন্তু অবিবাহিত শব্দ দিয়ে আইয়্যিমের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায় না। বিবাহিত হবার পরও কেউ আইয়্যিম থাকতে পারেন। আইয়্যিম হলো জুড়িহীন, ইংরেজিতে যাকে বলে single। আল্লাহ বললেন,

পৃথিবীর প্রথম দম্পতি বাবা আদম ও মা হাওয়া (আ.)। তাদের জন্য বিয়ে নামক সামাজিক চুক্তির কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ মানুষ বলতেই ছিলেন তারা দু'জন। সমাজের কোনো অস্তিত্বই তখন নেই। তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে বিয়ের প্রথা চালু হলো, প্রয়োজন পড়ল বিয়ের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতির। সেই থেকেই বিয়ের প্রচলন হয়ে আসছে, সকল রাষ্ট্রে ও সমাজেই বিয়ের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে আসা হয়েছে।

সিঙ্গেলদের বিয়ে দিয়ে দাও। এই হুকুম দ্বারা প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তি, যাদের স্বামী নেই, স্ত্রী নেই- তাদেরকে বলা হচ্ছে বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করতে, নিঃসঙ্গ জীবন পরিহার করতে।

কিন্তু বিয়ে মানেই তো পুরুষের জন্য বিশাল এক দায়িত্বের বোঝা কাঁধে এসে পড়া। স্ত্রী-সন্তানের ভরনপোষণসহ যাবতীয় চাহিদা তাকেই পূরণ করতে হবে। তার জন্য যদি প্রস্তুতি না থাকে? যদি কোনো আইয়্যিম ব্যক্তি অভাবী হন, তাহলে? তাহলে আল্লাহর বিধান হলো- 'যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন

সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।' (নুর: ৩৩) তার মানে আল্লাহ পরিষ্কার করে দিলেন, বিয়ে করতে বলা হচ্ছে মানে এই না যে, সামর্থ্য না থাকলেও করতে হবে। জোর-জবরদস্তির কিছু নেই, সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সংযম অবলম্বনই শ্রেয়।

পাত্র পাত্রী উভয়েই তাদের বিয়েতে মত ও অমত করতে পারে। অভিভাবকের মতামতও প্রয়োজনীয়, তবে সবার আগে পাত্র-পাত্রীর মত লাগবে। কেননা তারাই সারা জীবন একসাথে থাকবে, পরিবার গঠন করবে, তাই একে অপরের প্রতি রাজি-খুশি থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের দেশে এমনও দেখা যায়, অভিভাবকরা নিজেদের ইচ্ছেমত পাত্র-পাত্রী নির্বাচণ করেন, কথাবার্তা পাকা করে ফেলেন, তারপর পাত্র-পাত্রীকে জানান। এতে পাত্র-পাত্রী তাদের নিজেদের মত ও অমত প্রকাশের সুযোগ পায় না। এই ধরনের বিয়ে ইসলামে অনুমোদিত নয়।

• যাদের সামর্থ্য আছে, তাদের বিয়ের শৃঙ্খলা কী হবে, শর্ত কী হবে?

আমরা কোর'আন ও হাদিস পর্যালোচনা করে বিয়ের তিনটি শর্তের কথা পাই, যেগুলো ফরদ অর্থাৎ বাধ্যতামূলক। এর একটিও অপূর্ণ থাকলে সেই বিয়ে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক বৈধতা পায় না। শর্ত তিনটি হলো:

• ১. পাত্র-পাত্রীর সম্মতি,
• ২. মোহরানা আদায় ও
• ৩. সাক্ষীর উপস্থিতি।

প্রথমত, পাত্র পাত্রী উভয়েই তাদের বিয়েতে মত ও অমত করতে পারে। অভিভাবকের মতামতও প্রয়োজনীয়, তবে সবার আগে পাত্র-পাত্রীর মত লাগবে। কেননা তারাই সারা জীবন একসাথে থাকবে, পরিবার গঠন করবে, তাই একে অপরের প্রতি রাজি-খুশি থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের দেশে এমনও দেখা যায়, অভিভাবকরা নিজেদের ইচ্ছেমত পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করেন, কথাবার্তা পাকা করে ফেলেন, তারপর পাত্র-পাত্রীকে জানান। এতে পাত্র-পাত্রী তাদের নিজেদের মত ও অমত প্রকাশের সুযোগ পায় না। এই ধরনের বিয়ে ইসলামে অনুমোদিত নয়। অনেক ক্ষেত্রে পাত্রীর সম্মতিকে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করা হয়, অথচ বিশ্বনবী স্পষ্টভাবে বলেছেন, "বিবাহিতা মেয়েকে তার পরামর্শ ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না, কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "তার অনুমতি কীভাবে নিব?" বিশ্বনবী বললেন, "চুপ থাকাই হলো তার অনুমতি।" অর্থাৎ পাত্র পছন্দ হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করার পর পাত্রী যদি চুপ থাকে তাহলে সেটাকে "অনুমতি" হিসেবে ধরে নেওয়া যাবে। (মুসলিম, মিশকাত/৩১২৭)

দ্বিতীয়ত, বিয়েতে মোহরানা বাবদ পাত্রের পক্ষ থেকে পাত্রীকে নগদ অর্থ/সম্পদ প্রদান করা বাধ্যতামূলক। তবে মোহরানার অংক নির্ধারণের বেলায় ইসলামে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই, পাত্রের সাধ্য ও পাত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে মোহরানা নির্ধারণ করা বিধেয়। এখানে বিয়ের সাথে মোহরানার সম্পর্ক তথা আকিদাটা বুঝে নেওয়া দরকার। যেহেতু বিয়ে হলো একটি পরিবার গঠনের প্রথম ধাপ, আর আল্লাহর বিধানে পরিবারের শৃঙ্খলা হলো- স্বামী তার স্ত্রীর ভরণ পোষণসহ যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে, কাজেই দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই পুরুষ ব্যক্তিটি তার স্ত্রীর হাতে কিছু নগদ অর্থ-সামগ্রী তুলে দিয়ে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের "প্রতীকী" অনুশীলন করে। এর মাধ্যমে সে সমাজের কাছে বার্তা দেয় যে, এভাবেই সে বাকি জীবন তার স্ত্রীর প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের সাধ্য মোতাবেক অর্থ-সম্পদ প্রদান করবে এবং পরিবারের খেয়াল রাখবে। মোহরানা গ্রহণের মাধ্যমে স্ত্রীও তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। যেহেতু এটি প্রতীকী বিষয়, কাজেই ইসলাম এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করে দেয়নি। কত টাকা দিল বা কতখানি সম্পদ দিল সেটার পরিমাণ এখানে মুখ্য বিষয় না, মুখ্য বিষয় হলো মোহরানা দেওয়াটা। রসুলাল্লাহর সাহাবীদের মধ্যে যারা সহায়-সম্বলহীন ছিলেন, তারা একমুঠো খেজুরের বিনিময়ে বিয়ে করেছেন, কেউ সেটুকুও দিতে না পারায় কোর'আন শিক্ষা দেওয়াকে মোহরানা হিসেবে ধার্য করে বিয়ে করেছেন। কিন্তু আকিদা না বুঝে আমাদের দেশের বিয়েগুলোতে এত মোটা অংকের মোহরানা নির্ধারণ করা হয় যে, বিয়ের দিন ওই মোহরানা আদায় করা পাত্রের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। এই সুযোগে সমাজে একটি কুপ্রথা বিস্তারলাভ করেছে যে, মোহরানার টাকা প্রদান করার বাধ্য-বাধকতা নেই, স্ত্রীর কাছে মাফ চেয়ে নিলেই হবে।

তৃতীয়ত, বিয়েতে সাক্ষী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আগেই বলেছি বিয়ে হলো সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের একটি অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠান হতে হবে প্রকাশ্যে, সমাজের মানুষের উপস্থিতিতে। গোপনে,

বা লোকচক্ষুর অন্তরালে, সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হলে সেটা সামাজিক স্বীকৃতি পায় না। এজন্য বিশ্বনবী তাঁর সাহাবীদের বিয়েতে দফ (ঢোলের মত এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) বাজানোর নির্দেশ দিতেন এবং গায়ক পাঠাতে বলতেন। হাদিসে এসেছে, বিশ্বনবী বলেছেন- হালাল ও হারাম বিয়ের মধ্যে তফাৎ হলো দফ। (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ) অর্থাৎ যে বিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে, গান-বাজনা ও আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় সেটা ইসলামের আকিদাসম্মত হালাল বিয়ে। পক্ষান্তরে হারাম বিয়ে বা অবৈধ সম্পর্ক হলো সেটা যেটা গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে সম্পন্ন হয়।

বিশ্বনবীর স্ত্রী-সন্তান-পরিজন তথা পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সাহাবীদের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। তারা সবাই জানতেন রসুলাল্লাহ কবে কোথায় কাকে বিয়ে করেছেন, কে কোথায় থাকেন ইত্যাদি। রসুলাল্লাহ যখন যে স্ত্রীর ঘরে অবস্থান করতেন, তখন সেই স্ত্রীর ঘরই রাষ্ট্রীয় কার্যালয় হয়ে উঠত। অবাধে লোকজন যাতায়াত করত। রসুলাল্লাহর স্ত্রীগণ জাতির মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেন না, গোপনে থাকতেন না। বিভিন্ন যুদ্ধে পর্যন্ত তারা অংশ নিতেন। প্রত্যেকটা অভিযানে রসুলাল্লাহ কোনো না কোনো স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন, যাতে তাঁর সঙ্গী-সাথী, তাঁর শত্রু-মিত্র সবার কাছেই পরিষ্কার থাকে তাঁর বৈবাহিক জীবন। কোথাও কোনো অস্পষ্টতা না থাকে, সন্দেহ না থাকে। কারণ যেখানেই অস্পষ্টতা থাকবে সেখানেই শয়তান তার মিথ্যা ও গুজবের জাল তৈরি করবে এটা বিশ্বনবী ভালোভাবেই জানতেন।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের বৈবাহিক জীবনে ইসলামের উপরোক্ত নীতিগুলো কতটুকু মেনে চলা হয় তা আমাদের সবারই জানা। দুঃখজনক বিষয় হলো- যারা ইসলামের ধ্বজাধারী সেজে আছেন, প্রতিনিয়ত ইসলামের মাসলা-মাসায়েল জাতিকে শেখাচ্ছেন, সেই ধর্মীয় নেতাদের বৈবাহিক জীবন নিয়েও আজকাল বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উঠছে, অস্পষ্টতা তৈরি হচ্ছে, বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। এর কারণ আমাদের ওইসব ধর্মীয় নেতারা মুখে মুখে ধর্মের বুলি আউড়ালেও বাস্তবে তারাও আল্লাহর হুকুম ও রসুলাল্লাহর সুন্নাহ মেনে চলছেন না। রসুলাল্লাহ ও তাঁর সাহাবীগণের মত আমাদের ধর্মীয় নেতাদের বৈবাহিক জীবন প্রকাশ্য ও স্পষ্ট নয়। তারা কে কোথায় কয়টা বিয়ে করেছেন, তা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, তাদের একান্ত কাছের মানুষও অনেক সময় জানতে পারে না। যখন কারো বিরুদ্ধে আপত্তিকর অভিযোগ ওঠে, তখন অনুসারীরাও সন্দেহে পড়ে যায়। কে হুজুরের স্ত্রী আর কে স্ত্রী নয়- সেটা বের করার জন্য বোরকার রঙ, নখের সাইজ ইত্যাদি নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গলদঘর্ম হতে হয় অনুসারীদেরকে। এই ধোঁয়াশা যাতে সৃষ্টি না হয়, এই আপত্তিকর অভিযোগে যাতে অভিযুক্ত না হতে হয়, সেজনই ইসলামের বিধান ছিল প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে, দফ বাজিয়ে, আনন্দ-উৎসবের মাধ্যমে বিয়ে করা। মানবিক কারণ বা অমানবিক কারণ- কোনো কারণেই আল্লাহর এই সহজ-সরল বিয়ের বিধানকে অমান্য করার সুযোগ নেই। অমান্য করলে, বাড়াবাড়ি করলে, সেটার পরিণতিতে লজ্জিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

• বৈবাহিক জীবনের শৃঙ্খলা:

ইসলামের শৃঙ্খলা হলো, কোথাও যদি দু'জন মো'মেনও থাকেন, তাহলে তাদের মধ্যে একজনকে "আমির" নির্বাচন করে তার আনুগত্য করতে হবে। এই শৃঙ্খলা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনেই নয় কেবল, পারিবারিক জীবনেও বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ পরিবারও একটি সংগঠন আর সংগঠনের মেরুদণ্ড হলো আনুগত্য। পরিবারে যদি কোনো সর্বজনস্বীকৃত "কর্তা" না থাকে, তাহলে পারিবারিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে এবং পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসবে এতে সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষায় কর্তা কে হবে সেটা নির্দিষ্ট করে দিয়ে আল্লাহ বলেন, "পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এই জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা (পুরুষরা) তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। (নিসা: ৩৪)" অর্থাৎ ইসলামে পরিবারের শৃঙ্খলা রক্ষায় নারীদের উপর পুরুষদেরকে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেই সাথে নারী ও পুরুষ কার কী দায়িত্ব সেটাও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

• যুদ্ধকালীন বিয়ে: যুদ্ধবন্দি ও বহুবিবাহ

এতক্ষণ আমরা মো'মেনদের স্বাভাবিক জীবনের বৈবাহিক ও পারিবারিক বিধান নিয়ে আলোচনা করেছি, এবার আমরা আলোচনা করব মো'মেনদের যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপট নিয়ে। মনে রাখতে হবে উম্মতে মোহাম্মদী জাতির লক্ষ্য হলো সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করে ন্যায়, শান্তি ও সুবিচার কায়েম করা। এই জাতির জন্মই হয়েছে সংগ্রামের জন্য এবং প্রকৃতপক্ষে কোর'আন হলো একটি যোদ্ধা জাতির সংবিধান। এর বহু আয়াত নাজেল হয়েছে যুদ্ধকালীন বাস্তবতার জন্য।

একবার ভাবুন তো, পরাজিত সৈন্য ও তাদের স্ত্রী-পুত্রদের সাথে বর্তমান দুনিয়ার তথাকথিত সভ্য সেনাবাহিনীগুলো কী ধরনের আচরণ করে থাকে? বিশেষজ্ঞদের ধারণামতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে আক্রমণ করে, এই সময় এক কোটিরও বেশি সোভিয়েত নারী জার্মান সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয় এবং এর ফলে ৭,৫০,০০০ থেকে ১০,০০,০০০ যুদ্ধশিশুর জন্ম হয়। (উইকিপিডিয়া) যুদ্ধের পশ্চাতে এই ধর্ষিত নারী ও যুদ্ধশিশুদেরকে জার্মান সরকার বা জার্মান সৈন্যরা নিজেদের পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করে নিলে কেমন হত, এমনটা কখনও কল্পনায় এসেছে আমাদের? আসেনি, কারণ এটা সম্ভব নয় বলে ধরেই নিয়েছি আমরা।

যখন উম্মতে মোহাম্মদী যুদ্ধে নামবে, তখন বহু ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে এটা স্বাভাবিক। সেই পরিস্থিতি মোকাবেলার উপায় কী হবে, বিজিত জাতির সাথে কী আচরণ করা হবে, তাদের পুরুষরা যখন নিহত হবে তখন নারীদের জন্য কী করা হবে, এটি উম্মতে মোহাম্মদীর সংবিধানে যদি না থাকে তাহলে কোর'আনকে নিখুঁত, নির্ভুল, পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত জীবনবিধান বলা যায় কি? যায় না। কাজেই আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে সেই বিধানগুলো রেখেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সেগুলো যুদ্ধের বিধান, যুদ্ধকালীন বিধান। যারা যোদ্ধা নয়, যারা উম্মতে মোহাম্মদীর দায়িত্ব পালন করবে না তাদের জন্য ওসব বিধান নয়।

আজ আমরা দেখতে পাই, ইসলামের সেই যুদ্ধকালীন সঙ্কটের বিধানগুলো নিয়ে ইসলামবিদ্বেষী গোষ্ঠী সমালোচনায় মেতে ওঠে, ইসলাম কেন যুদ্ধবন্দিনীদেরকে গণিমত হিসেবে গ্রহণ করার বিধান রেখেছে সেটা নিয়ে তাদের তীব্র আপত্তি! বেশ, আমাদেরকে বলুন তাহলে- যুদ্ধের পশ্চাতে যেসব নারী বিধবা হবে, যেসব শিশু এতিম হবে, যেসব পরিবার উপার্জনক্ষম মানুষকে হারিয়ে আর্থিকভাবে পথে বসে যাবে, তাদের ভাগ্যে কী ঘটবে? আপনারাই সমাধান দিন।

নিন্দুকরা ইসলামের যুদ্ধবন্দিনী গ্রহণের বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যেন উম্মতে মোহাম্মদীর যোদ্ধারা বিজিত জাতির নারীদেরকে গণিমতের "মাল" হিসেবে গ্রহণ করত ভোগ করার জন্য। না, ইতিহাস এই অভিযোগ সমর্থন করে না। ইতিহাস বলে- নারীদেরকে ভোগ্যবস্তু হিসেবে নয় রবং মানুষ হিসেবেই গ্রহণ করা হত।

বর্তমানে বিভিন্ন পরাশক্তিগুলোর সৈন্যদের দ্বারা বিজিত রাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করে ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা দেখতে দেখতে আমরা এতটাই প্রভাবিত হয়ে গেছি যে, এখন ভাবতেও পারি না পৃথিবীতে এমন সেনাবাহিনী ছিল যারা পরাজিত ও মৃত সেনাদের স্ত্রী-পুত্রদেরকে রাস্তায় ফেলে না এসে নিজেদের পরিবারের সদস্য বানিয়ে নিত।

একবার ভাবুন তো, পরাজিত সৈন্য ও তাদের স্ত্রী-পুত্রদের সাথে বর্তমান দুনিয়ার তথাকথিত সভ্য সেনাবাহিনীগুলো কী ধরনের আচরণ করে থাকে? বিশেষজ্ঞদের ধারণামতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে আক্রমণ করে, এই সময় এক কোটিরও বেশি সোভিয়েত নারী জার্মান সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয় এবং এর ফলে ৭,৫০,০০০ থেকে ১০,০০,০০০ যুদ্ধশিশুর জন্ম হয়। (উইকিপিডিয়া) যুদ্ধের পশ্চাতে এই ধর্ষিত নারী ও যুদ্ধশিশুদেরকে জার্মান সরকার বা জার্মান সৈন্যরা নিজেদের পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করে নিলে কেমন হত, এমনটা কখনও কল্পনায় এসেছে আমাদের? আসেনি, কারণ এটা সম্ভব নয় বলে ধরেই নিয়েছি আমরা। কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদী জাতির ইতিহাস পড়ে দেখুন, যুদ্ধ চলাকালীন বা যুদ্ধ শেষে ধর্ষণের তো প্রশ্নই আসে না, বরং যেসব সৈন্য ও রাজপরিবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, প্রাণ হারিয়েছে, যুদ্ধ শেষে তাদের পরিবার যেন আশ্রয়হীন হয়ে না পড়ে, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে বা ভিক্ষাবৃত্তি করতে বাধ্য না হয়, সেজন্য উম্মতে মোহাম্মদী ওইসব পরিবারের নারী শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করে নিজেদের পরিবারের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে।

আজ পৃথিবীময় মার্কিন সৈন্যদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে কতই না সন্তান পিতা হারাচ্ছে, কতই না নারী স্বামী হারাচ্ছে, কত বোন তার ভাইকে হারাচ্ছে। একজন মার্কিন সৈন্যকে দেখেছেন ইরাক থেকে বা আফগানিস্তান থেকে একটা এতিম শিশুকে বিমানে করে আমেরিকা নিয়ে গেছে এবং নিজের পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে?

প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুলোর সাথে উম্মতে মোহাম্মদীর যুদ্ধের তফাৎ এখানেই। উম্মতে মোহাম্মদী কোনো দেশ ও সেই দেশের জনগণকে ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধ করত না, যুদ্ধ করত ওই দেশ ও দেশের জনগণকে অত্যাচারী অপশক্তির হাত থেকে মুক্ত করে ন্যায়, শান্তি ও সুবিচার দেওয়ার জন্য। কাজেই ওইসব

যুদ্ধের বড় অংশজুড়ে থাকত "দায়বদ্ধতা"। প্রত্যেকটা মৃত্যুর পর, প্রত্যেকটা রক্তপাতের পর উম্মতে মোহাম্মদী সেই মৃত্যু ও রক্তপাতের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করত। যেই নারী তার স্বামীকে হারিয়েছে, যেই সন্তান তার পিতাকে হারিয়েছে, যেই রাজপরিবারের সদস্যরা তাদের রাজত্ব হারিয়ে পথে বসেছে- তাদের সবার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া উম্মতে মোহাম্মদীর ঈমানী দায়িত্ব ছিল। সেই দায়িত্ব পালনের জন্য স্থান-কাল-পাত্র বুঝে রসুলাল্লাহ ও তাঁর সাহাবীদেরকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, শত্রুপক্ষের আত্মীয়-স্বজনকে নিজের আত্মীয় স্বজনের মত মর্যাদা দিতে হয়েছে। শত্রুর ছেলেকে নিজের ছেলের জায়গায় বসাতে হয়েছে। সহযোদ্ধা ভাইকে যে শত্রুরা হত্যা করেছে, সেই শত্রুর পরিবারকে নিজের পরিবার বলে গণ্য করতে পারা কি চাট্টিখানি বিষয়? উম্মতে মোহাম্মদীকে সেটা পারতে হয়েছে। যা ওই যুগের বাস্তবতায় নজিরবিহীন ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রকৃতপক্ষে আজ যারা ইসলামের যুদ্ধবন্দিনী গ্রহণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উম্মতে মোহাম্মদী জাতিকে নারীলোভী হিসেবে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেন, তাদের সমস্যা হলো তারা নিজেরাই নারীকে যৌনসামগ্রী ছাড়া কিছু ভাবতে পারেন না, ফলে উম্মতে মোহাম্মদী কেন নারীদেরকে যুদ্ধের ময়দানে ফেলে না এসে নিজেদের পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন সেটা তাদের ক্ষুদ্র মানসিকতায় বুঝে আসে না। যে উম্মতে মোহাম্মদীর যোদ্ধারা বিয়ের রাতে বাসরঘরে স্ত্রীকে রেখে রণাঙ্গনে ছুটে যেতেন জেহাদে শহীদ হবার আকুল পিপাসায়- সেই উম্মতে মোহাম্মদী যে নারীলোভী ছিলেন না সেটা বোঝার জন্য বেশিকিছু না লাগলেও অন্তত বিদ্বেষমুক্ত ও নারীবান্ধব একটা মন লাগবে। তা অনেক সমালোচকেরই নেই।

• বহুবিবাহের আরও কিছু কারণঃ

যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপট ছাড়াও আরও কিছু কারণ রয়েছে, যার দরুন স্বাভাবিক জীবনেও আল্লাহ পুরুষদেরকে বহুবিবাহের অনুমোদন দিয়েছেন। তবে এটি বোঝার জন্য একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ হচ্ছেন ন্যায় ও সুবিচারের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। একজন পুরুষ বা একজন নারী কোথাও সুবিচার না পেলেও আল্লাহর কাছে পাবেন। কাজেই শুধু একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষের স্বার্থ রক্ষা নয়, আল্লাহর বিধান সব মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে দায়বদ্ধ।

আধুনিক নারীরা পুরুষের বহু বিবাহের ব্যাপারটি মানতে রাজি না, তারা মনে করে ইসলাম এই অপমানজনক পুরুষতান্ত্রিক প্রথাটিকে নারীর উপরে চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর জনসংখ্যা জরিপে দেখা যায় যে, পুরুষের চেয়ে নারীদের সংখ্যা অনেক দেশেই বেশি। এখন একজন পুরুষ যদি একটি বিয়েই করে, তাহলে বাদবাকী নারীদের কী হবে? হয় তাদের বিয়ে ছাড়া জীবন কাটিয়ে দিতে হবে, না হয় অবৈধ পথ বেছে নিতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, সংসারের আশ্রয় না পাওয়ায় সমাজই তাকে বাধ্য করবে 'অসতী' হতে। তার চেয়ে কি ভাল নয় যৌথ পরিবারে ঐক্যবদ্ধভাবে অন্য নারীর সঙ্গে স্ত্রীর অধিকার ও সম্মান নিয়ে সহমর্মী হয়ে বসবাস করা? এতে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেল, একাকীত্ব দূর হল, জীবনের অবলম্বনও হল, অবিচার অনাচারের পথও রুদ্ধ হল।

ইদানীং পাশ্চাত্যের ধর্মহীন বস্তুবাদী সভ্যতার প্রভাবে মানবজীবন থেকে যাবতীয় নৈতিকতার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার যে প্রবণতা চলছে, তার অশুভ থাবা পড়েছে বিয়েপ্রথার উপরেও। বিয়ে নামক সামাজিক বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে লিভ টুগেদার অর্থাৎ বিবাহবহির্ভুত অবাধ মেলামেশা। এর অবশ্যম্ভাবি পরিণতি অবশ্য এড়ানো যায়নি। বিয়ের মত পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকারের বাধ্যবাধকতা যেহেতু থাকে না, সামাজিক বিধি-নিষেধের বালাইও নেই, কাজেই সাময়িক ভালো লাগা শেষে পরিবারব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় ভয়াবহ সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে ওইসব দেশে। পরিণত বয়সে লক্ষ লক্ষ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সামাজিক অনিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তা নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

তাছাড়া একজন পুরুষের স্ত্রী যদি সন্তান ধারণে অক্ষম হয়, তখনও তার স্বামী কি আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না? অথবা প্রথমা স্ত্রী অসুস্থ হলে তখন সেই পুরুষ কি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে পরিবারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারবে না? মহান আল্লাহর দেওয়া কোন বিধানই একপেশে বা অন্যায় হতে পারে না, আল্লাহর সকল বিধান হোচ্ছে চূড়ান্ত ন্যায় ও ভারসাম্যে পূর্ণ এবং প্রাকৃতিক। অনেকেই আমরা মনে করি, পুরুষের বহু বিবাহ কেবলমাত্র পুরুষের প্রয়োজনে, কিন্তু আসলেই কি তাই? একাধিক নারী একটি সংসারে যদি সহোদরার ন্যায় অবস্থান করতে পারেন, সন্তানদেরকে মানুষ করার ক্ষেত্রে, পারস্পরিক সেবাযত্নে এবং সংসারকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করার ক্ষেত্রে তারা নিজেরাও একে অপরের

দ্বারা সাহায্য-সহযোগিতা ও সুবিধা লাভ করতে পারেন, তা কি ভেবে দেখেছেন?

উপরন্তু একাধিক বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে কোন আয়াতে? সেটাও লক্ষণীয়। আয়াতটি হলো, আল্লাহ পাক বলেন, "আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাথভাবে পুরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। (নিসা: ৩)" অর্থাৎ একাধিক বিয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে শুধুই মানবিক কারণে এবং এতিম মেয়েরা যাতে যথাযথ অধিকার নিয়ে পরিবারের মধ্যে বসবাস করতে পারে সেটা নিশ্চিত করাই এই অনুমতির লক্ষ্য। কোনো কোনো ইসলামী চিন্তাবিদ এমনও বলেছেন যে, এখানে এতিম বলতে প্রকৃতপক্ষে "আশ্রয়হীন" নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে, তারা এতিমও হতে পারেন, বিধবাও হতে পারেন বা তালাকপ্রাপ্তও হতে পারেন। তারা যেন নিঃসঙ্গ অবস্থায় অপ্রাকৃতিক জীবনযাপনে বাধ্য না হন, সেজন্য আল্লাহ সামর্থবান মো'মেনদেরকে অনুমতি দিচ্ছেন তাদেরকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদায় পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার জন্য।

পাঠক, লেখার পরিধী ইতোমধ্যেই বড় হয়ে গেছে। তবু আলোচনার বাইরে থেকে গেল অনেক কিছুই। ইনশা'আল্লাহ সেইসব বিষয় নিয়ে অন্য কোনো লেখায় আলোচনা করা যাবে। আপাতত এখানেই বিষয়বস্তুর ইতি টানতে চাই এবং সেই সাথে জানিয়ে রাখতে চাই, ইদানীং পাশ্চাত্যের ধর্মহীন বস্তুবাদী সভ্যতার প্রভাবে মানবজীবন থেকে যাবতীয় নৈতিকতার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার যে প্রবণতা চলছে, তার অশুভ থাবা পড়েছে বিয়েপ্রথার উপরেও। বিয়ে নামক সামাজিক বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে লিভ টুগেদার অর্থাৎ বিবাহবহির্ভুত অবাধ মেলামেশা। এর অবশ্যম্ভাবি পরিণতি অবশ্য এড়ানো যায়নি। বিয়ের মত পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকারের বাধ্যবাধকতা যেহেতু থাকে না, সামাজিক বিধি-নিষেধের বালাইও নেই, কাজেই সাময়িক ভালো লাগা শেষে পরিবারব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় ভয়াবহ সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে ওইসব দেশে। পরিণত বয়সে লক্ষ লক্ষ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সামাজিক অনিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তা নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেকের অফুরন্ত টাকা, সেই টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা গেলেও সম্পর্ক, সম্প্রীতি ও ভালোবাসা কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। আর্থিক চুক্তির ভিত্তিতে ওইসব দেশে সঙ্গী ভাড়া পাওয়া যায়, তাদের কাজ হলো নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ অথবা বৃদ্ধার সাথে কথাবার্তা শেয়ার করা। প্রকৃতির চরম প্রতিশোধের এখানেই শেষ নয়, সমকামিতার মত অরুচিকর বাস্তবতার মুখোমুখী হয়ে পাশবিকতার ষোলোকলা পূরনের আয়োজন চূড়ান্ত হয়েছে!

এদিকে বিয়ের নামেও চলছে আরেক নৈরাজ্য। যৌতুকের বলি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ নারী। যৌতুকের টাকা যোগার করতে না পারায় বিবাহ-উপযুক্ত কন্যা আইয়্যিম থেকে যাচ্ছে। অথচ যৌতুকের প্রচলন ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে ইসলামে যেটা একান্ত বাধ্যতামূলক অর্থাৎ স্ত্রীকে নগদ দেনমোহর প্রদান, তা উপেক্ষিত হয়ে থাকছে। পেছনে বলে এসেছি বর্তমানে বিয়েতে লক্ষ লক্ষ টাকার দেনমোহর ধার্য করা হয়, যা কখনোই পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। কার্যত বিয়ে হয় দেনমোহর ছাড়াই। কোনো কারণে সংসার ভাঙলে মামলা করে দেনমোহরের টাকা আদায় করতে হয় তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে। মোহরানার বৃহৎ অঙ্ক আসলে বরের গলায় ফাঁস হয়ে ঝুলে থাকে। মোহরানার টাকা শোধের সামর্থ্য না থাকায় বনিবনা না হলেও তাকে সম্পর্কের লাশ বয়ে বেড়াতে হয়, তালাকের কথা ভাবতেও পারে না। অনেক সময় বিষয়টি নারী নির্যাতনের পর্যায়ে গড়ায়। এভাবে আল্লাহর দেওয়া বিধানকে বিকৃত করায় বিয়ে ও তালাক হয়ে উঠেছে অত্যন্ত কঠিন ও জটিল প্রক্রিয়া। সমাজে সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ছে অশ্লীলতা, ব্যাভিচার, পরকীয়া ইত্যাদি অভিশাপ। এদিকে ইসলামে বহুবিবাহের অনুমোদন থাকায় তার যথেচ্ছ অপব্যবহার ঘটছে পৃথিবীময়। তাছাড়া আরব দেশগুলোতে যৌনদাসী রাখার বিধান সর্বজনগৃহীত ও আইনসম্মত বলে মানা হয়। আর তা দেখে ইসলামের সমালোচকরা দায়ী করেন ইসলামকে। তারা মনে করেন, ইসলামই বুঝি অমানবিক এই প্রথাকে চালু করেছে এবং আধুনিক যুগে টিকিয়ে রেখেছে। তাদের বদ্ধমূল ধারণার অসারতা প্রমাণের জন্য এবং সার্বিক বিবেচনায় এই প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই আমাদের প্রত্যাশা।

যুগ্ম সাহিত্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ

ব্যক্তিগত আমলের বেড়াজালে ইসলাম

হেযবুত তওহীদের এমাম, হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম এর ভাষণ থেকে সম্পাদিত

ইসলাম সম্পর্কে নানা ধরনের আকিদা বা Concept এখন এই জাতির মধ্যে বাসা বেঁধেছে। এক দল ভাবছেন শরিয়তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাসলা-মাসায়েল নিয়ে তারা গবেষণা করবেন, করে ব্যক্তিজীবনে সেগুলোকে প্রয়োগ করে একেকজন পাক্কা মুসল্লি হবেন। ভালো মুসল্লি হলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তিনি ভালো মো'মেন হবেন, তিনি জান্নাতে যাবেন। এতটাই সতর্ক থাকছেন যে ওজু করার সময় যাতে নাকের একটা পশমও শুকনো না থাকে সেটাও খেয়াল করছেন। পশম না ভিজলে নামাজ হবে কি হবে না তার মাসলা মাসায়েল খুঁজে বের করতে করতে ঠাণ্ডা লাগিয়ে ফেলেন।

ভালো মুসলমান হওয়ার জন্য, আল্লাহর চোখে ভালো মুত্তাকি হওয়ার জন্য কতই আপ্রাণ প্রচেষ্টা তারা করছেন। আজকে মুসলমানদেরকে এই কথাটা বুঝতে হবে, সংখ্যায় ১৬০ কোটি হয়েও আমরা কেন মার খাচ্ছি? সেই মার খাওয়ার কারণটা কোথায় সেটা আমাদের আগে নির্ণয় করতে হবে। আমল প্রচুর হচ্ছে। রোজা রাখলে দিনের বেলা আপনি কিছু খাবেন না এটাই নিয়ম। কিন্তু মুফতি সাহেবদেরকে টিভিতে, পত্রিকায় প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, কোনো রোগীকে এন্ডোসকপি করা হলে তার রোজা ভাঙবে কিনা। মুফতি সাহেবও তেমন। তিনি অনেক ফতোয়ার বই ঘেঁটে ঘেঁটে বের করলেন যে যদি এন্ডোসকপি করার সময় কোনো ঔষধ রোগীর শরীরে ঢুকে যায় তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ঔষধ না ঢোকে তাহলে রোজা ভাঙ্গবে না। তাদের এই সাধারণ জ্ঞানটাই চলে গেছে যে, যেহেতু রোগীর অবস্থা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে তাকে এন্ডোস্কপি করাতে হচ্ছে, তার জন্য তো রোজা রাখার নির্দেশই নয়। আল্লাহ তো রোগীদেরকে রোজা রাখা থেকে ছাড় দিয়েছেন, এটাই হয়তো তাদের জানা নেই। তাদের আকিদা হচ্ছে, মরি-বাঁচি যা-ই হোক রোজা ভাঙ্গা যাবে না। যত কষ্টই হোক রোজা রাখতেই হবে। অথচ আল্লাহ তাঁর বিধানকে সহজ করে দিয়েছেন যে সফরে গেলে রোজা রাখতে হবে না। পরে এই সংখ্যা পূরণ করে নিবেন। তারা যুক্তি দাঁড় করাবেন যে, আগের মানুষ হয়তো উটের পিঠে চড়ে যেত, তাদের কষ্ট হতো। আর এখন আমরা বিমানে যাই, এসি বাসে যাই। আমাদের তো কোনো কষ্ট হয়

না। সুতরাং আমরা রোজা রাখতে পারি। অর্থাৎ আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি, তাদের ঈমানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমি বলছি যে তারা এই আমলটাকে ছাড়তে পারছেন না। কারণ এই আমল করে উনারা জান্নাতে যেতে চান।

আমি মুফতি সাহেবদের একটি প্রশ্ন করতে চাই। কিছুদিন আগে পথে যেতে মাগরিবের সময়ে একটা জামে মসজিদের সামনে যানজটে পড়লাম। কমপক্ষে সাত থেকে আটটা বাস দাঁড়ানো। কয়েকজন যাত্রী বাইরে ঘুরাফেরা করছিলেন। জানতে চাইলাম কী ব্যাপার, কী হয়েছে? একজন আমাকে বললেন, "ভাই কী করব? প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেছে মাগরিবের নামাজের বিরতি দিয়েছে। যাত্রীদের কয়েকজন মসজিদে নামাজ পড়তে গেছেন।" আমি বললাম যে, "এই বাসের মধ্যে কি হিন্দু, বৌদ্ধ বা অন্য ধর্মের কেউ নেই? কোনো রোগী বা বিদেশগামী যাত্রী নেই? এই বাসের মধ্যে অন্যান্য সমস্যাগ্রস্ত লোক নেই? যদি থাকে তাদের কী অবস্থা হবে?"

আমার প্রশ্ন হলো, সংখ্যার জোরে কয়েকজন তোমরা এই মাগরিবের সময়ে বাস দাঁড় করিয়ে যে মসজিদে ঢুকলে, তোমরা মনে করছ যে তোমরা ভালো কাজ করছ, উত্তম আমল করছ। অর্থাৎ মাগরিবের নামাজ যেন কাজা না হয় সেজন্য বাস দাঁড় করিয়ে নামাজ পড়ছ। নামাজের প্রতি তোমরা শতভাগ মনোযোগী, যদিও সবাই মুসাফির। কিন্তু অন্যান্য যারা নামাজের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের সুযোগ, সুবিধা, মানবাধিকারের কথাটা বেমালুম ভুলে গেলে, অথচ যেটা ছিল ইসলামের উদ্দেশ্য। আমরা যারা ব্যক্তিগত আমল করে পাগলপারা, আমাদের আমলের কারণে যাদের অসুবিধা হচ্ছে তারা কিন্তু স্রেফ ধর্মীয় সেন্টিমেন্টের

ভয়ে তাদের অসুবিধার কথা বলছে না। কিন্তু মনে মনে ঠিকই ক্ষুব্ধ হচ্ছে, রাগ হচ্ছে। এখন এ কথা আমি বললে আমাকেও ইসলামের শত্রু বানিয়ে অপপ্রচার চালানো শুরু হবে।

কিন্তু সাবধান! আজকে ইসলামের মাহাত্ম্য নিয়ে, গৌরব নিয়ে, উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলতেই হবে। ইসলামকে আজ অযৌক্তিক ধর্মে পরিণত করা হয়েছে। জুলুমের ধর্মে পরিণত করা হয়েছে। অনর্থক, কূপমণ্ডূকতার ধর্মে পরিণত করা হয়েছে। এজন্যই ইসলাম চাই বিধায় একজন মো'মেন হিসাবে আজকে কথা বলছি, এটা আমার আত্মসমালোচনা। আজ জীবনের এ পর্যায়ে এসে বুঝলাম যে অতীতে আমিও তো এমনই করেছি। নিজেদের আমল শতভাগ করে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু অন্যদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে একটুও ভাবিনি, কেউ এই কথা মনেও করিয়ে দেয়নি। কিন্তু এখন বুঝি যে, ইসলামের আত্মা কী। সেটা হচ্ছে, সমাজে বিরাজিত সকলের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। আজ সেটা হারিয়ে গেছে।

আল্লাহ মুসাফিরদের জন্য কী ধরনের এহসান বা ছাড় দিয়েছেন, তাদের আমলের ক্ষেত্রেও কী কী এহসান করেছেন তা কোর'আনেই বলা আছে। আর আল্লাহর রসুল (সা.) নিজেও আমল করে পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছেন যে সফরে থাকলে বা জরুরি অবস্থায় আপনারা মাগরিব আর এশার সালাত একসাথে পড়তে পারেন। আসরের আর যোহরের সালাত একসাথে পড়তে পারেন। তাহলে রাস্তার পাশে বাস দাঁড় করিয়ে রোগী বা বিদেশগামী যাত্রীদের দেরি করিয়ে যে সময় নষ্ট করছেন এটা কি ইসলামসম্মত কাজ হলো? এই প্রশ্ন আমি মুফতি সাহেবদেরকে করছি। এখানে আমি যুক্তির খাতিরে বলছি, সমস্ত বাস যদি একজনের আনুগত্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিছু লোকের দ্বারা রিজার্ভ করা হয়ে থাকে, যেমন বাসের সবাই তাবলিগের সদস্য বা সবাই কোনো পীরের মুরিদ তাহলে সেই কাজ তারা করতে পারেন। কারণ সেখানে সকলের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য এক।

প্রসঙ্গটা তুলছি এজন্যই যে, এখন ব্যক্তিগত আমল করে মিজানের পাল্লা ভারি করার জন্য সবাই উদগ্রীব কিন্তু সমাজ নিয়ে, অপরের শান্তি-অশান্তি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার ফুরসত কারো নেই। এই অবস্থার কারণ ইসলামের প্রকৃত আকিদা হারিয়ে যাওয়া। আল্লাহ মো'মেনদেরকে বিভিন্ন ধরনের আমল করার তাগিদ দিয়েছেন এজন্যই যে সে এসব আমল করে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা সাম্য, মানবাধিকার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মানসিকতা ও চরিত্র অর্জন করতে পারবে। সেই উদ্দেশ্যই যদি হারিয়ে যায় তাহলে আমলের প্রক্রিয়ার কোনো মূল্য থাকে না।

আল্লাহ রসুল (সা.) সেই জাতিকে দিয়ে তৎকালীন অর্ধদুনিয়া পাল্টে দিলেন কীভাবে? এর উত্তরে হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী বললেন, এর কারণ তাদের আকিদাই তাদেরকে পাল্টে দিয়েছে। তারা সমাজে সবচেয়ে উপেক্ষিত মানুষ ছিল। তারা ছিল শিক্ষাহীন দীক্ষাহীন, লেখাপড়াহীন জাতি। তারা পৃথিবীর ইতিহাস উল্টে দিয়েছিল। কারণ তাদের আকিদা। আমাদের এই জাতির সদস্যরা আল্লাহর সান্নিধ্য চান, পরকালে জান্নাতে যেতে চান। তারা কষ্ট করে হলেও আমল করে করে জান্নাতে যেতে চান। কিন্তু আমল করে কি জান্নাতে যাওয়া যাবে?

• মানুষের প্রকৃত কাজ কী?

আসুন দেখি আল্লাহর রসুল কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, "মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ - ফাদাখালাল জান্নাতা" যে বলবে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সে জান্নাত যাবে। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র মানে কী সেটাও আমাদের জানতে হবে। বর্তমানে 'ইলাহ' আর 'মাবুদ' দুটো শব্দেরই অনুবাদ করা হয় 'উপাস্য'। এ কারণে কলেমার অর্থ করা হয়, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই বা উপাস্য নেই। এই অর্থ ভুল। 'মাবুদ' শব্দের অর্থ 'উপাস্য'। কিন্তু কলেমায় আল্লাহ তো 'মাবুদ' নামটি ব্যবহার করেননি, তিনি ব্যবহার করেছেন ইলাহ। 'ইলাহ' অর্থ হচ্ছে হুকুমদাতা বা সার্বভৌমত্বের মালিক। তাহলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র অর্থ হলো, "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো হুকুমদাতা নেই।" সুতরাং কলেমার সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হলো, "আমরা আল্লাহর হুকুম বিধান ছাড়া অন্য কারো হুকুম বিধান মানবো না।" আল্লাহর বিধান আমরা কেন মানবো এর একটা যৌক্তিক কারণও আছে। সেই কারণটাও আমাদের জানতে হবে, কেননা যুক্তিহীনভাবে কোনো কিছু বিশ্বাস করা বা কোনো কাজ করাকে ইসলাম সমর্থন করে না।

আল্লাহ মানুষকে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ মালায়েকদেরকে একত্রিত করে বললেন আমি পৃথিবীতে খলিফা পাঠাবো (সুরা বাকারা ৩০)। আঠাযুক্ত মাটি দিয়ে তিনি আদমকে (আ.) তৈরি করলেন। তারপর মালায়েকদেরকে বললেন, আমি যখন এর ভিতর রুহ ফুঁকে দেব, তোমরা সবাই সেজদা করবে। সবাই তখন আদমকে (আ.) সেজদা করল,

ইবলিস সেজদা করল না। ইবলিসকে আল্লাহ বললেন, আমি যাকে নিজ হাতে বানালাম তুই তাকে সেজদা করলি না কেন? কীসে তোকে বাধা দিল? ইবলিস বলল, ও হচ্ছে মাটির তৈরি আর আমি হচ্ছি আগুনের তৈরি। তখন আল্লাহ বললেন, ও! অহংকার? অহংকার করে এখানে আর থাকতে পারবে না। এখান থেকে নেমে যাও। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তোয়ানির রাজিম। ইবলিশ শয়তান আল্লাহর নৈকট্য থেকে বিতাড়িত হয়ে গেল। তখন ইবলিস আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করল যে, "তুমি যার কারণে আমাকে বিতাড়িত করলে, আমাকে অবকাশ দিলে আমি প্রমাণ দিব যে সেও তোমার পথে থাকবে না।" আল্লাহ বললেন, "আমি তোকে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিলাম।" তখন ইবলিস বলল, "আমি তোমার আদমের পথে ডানে বামে ওঁৎ পেতে বসে থাকবো। তাদেরকে তোমার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবো। তুমি দেখবে অধিকাংশ বান্দাদেরকে আমি নিয়ে গেছি।" তখন আল্লাহ বললেন, "আমার মোখলেস বান্দার উপর তোর কোনো হাত নেই।" চ্যালেঞ্জ ও পাল্টা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেল।

আল্লাহ বাবা আদম (আ.) থেকে মা হাওয়াকে বানালেন। দু'জনকে জান্নাতে থাকতে দিলেন। একটিমাত্র নিষেধ করলেন যে ঐ গাছের নিকটে তোমরা যাবে না। কিন্তু শয়তান তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়ে আল্লাহর সেই একমাত্র আদেশটি অমান্য করাল। বাবা আদম (আ.) তওবা করলেন, "রাব্বানা জালামনা আনফুসানা... হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের সত্ত্বার উপর অন্যায় করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব (সুরা আরাফ ৭:২৩)। আল্লাহ আদমের (আ.) তওবা কবুল করলেন। তওবা কবুল করার পর তিনি বললেন, "তুমি আর তোমার স্ত্রী আর এখানে থাকতে পারবে না। এখান থেকে নেমে যাও। কিছু কালের জন্য তোমাদের জীবিকা রইল পৃথিবীতে। ইবলিস ও তোমরা একে অপরের শত্রু হিসাবে নেমে যাও।"

এইভাবে আমরা দুনিয়াতে নেমে আসলাম। আমরা সবাই আদম-হাওয়ার সন্তান, বনি আদম। আমাদের সামনে এখন একদিকে আল্লাহর হুকুম আর অন্যদিকে ইবলিসের প্ররোচনা; ডান-বাম, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম আর আমি মধ্যখানে আদম। আমি কোনটা গ্রহণ করব এটাই আমার পরীক্ষা, আমার নফসের পরীক্ষা। আমার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির পরীক্ষা- আমি কোন দিকে যাবো। যদি আমি ডান দিকে যাই, আল্লাহর হুকুম মানি তবে আমি মো'মেন। আর যদি আমি বাম দিকে যাই তবে আমি কাফের। আমার পরিণতি হবে জাহান্নাম। একদিকে আল্লাহর হুকুম আর আরেকদিকে ইবলিসের প্ররোচনা। একদিকে হেদায়াহ আর আরেকদিকে দালালাহ। একদিকে আল্লাহর তওহীদ আর আরেকদিকে গায়রুল্লাহ। এই দুইয়ের টানাটানি, দুইয়ের সংঘাত। মানবজাতি কোন দিকে যাবে সেটার উপর নির্ভর করবে মানুষ দুনিয়াতে শান্তিতে থাকবে না অশান্তিতে থাকবে। একদিকে সে আল্লাহর খলিফা, আল্লাহর প্রতিনিধি (Representative)। তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কাজ করতে হবে। যদি সে আল্লাহর খেলাফত করে তবে সে মো'মেন, সে জান্নাতি। আর যদি সে আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে ইবলিসের খেলাফত করে সে কাফের, সে জাহান্নামি। এখন মানুষের সামনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা যে মানুষ এই দুনিয়াতে কি আল্লাহর খেলাফত করবে, আল্লাহর আনুগত্য করবে, সে কি দুনিয়াতে কি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিবে? যদি সে আল্লাহর হুকুম মেনে নেয়, আল্লাহর খেলাফত করে তাহলে সে দুনিয়াতে সে থাকবে শান্তিতে ন্যায়বিচারে, সুবিচারে। আর যদি সে ইবলিসের হুকুম মানে, যদি সে বাম দিকে যায় তবে সে থাকবে অশান্তির মধ্যে। পরকালে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর যদি সে ডান দিকে যায় সে জান্নাতে যাবে। এই আকিদা আজকে নেই। মানুষ ভুলে গেছে যে সে আল্লাহর খলিফা। তাকে আল্লাহর খেলাফত করতে হবে দুনিয়াতে। আল্লাহর খেলাফত করাই তার মুখ্য এবাদত। আল্লাহ বলেছেন,, আমি জীন এবং ইনসানকে আমার এবাদত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি (সুরা যারিয়াত ৫৬)। আল্লাহর হুকুম দিয়ে সমগ্র বিশ্বের মানবজাতিকে পরিচালনা করা, আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করে পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাই হচ্ছে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে তার এবাদত।

• মানবজাতির ও মুসলিমদের প্রতি হেযবুত তওহীদ

এই আকিদাই আজ মুসলিমদের জানা নেই যে, তারা আল্লাহর খলিফা, তাদেরকে আল্লাহর খেলাফত করতে হবে। সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যে তাদেরকে তাঁর খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেছেন তাদের মহাশত্রু প্রতারক ইবলিশ এই কথা তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে। ফলে আদম সন্তানদের এটা জানা নেই, অগণিত আমলকারী পরহেজগার মুসল্লিদেরও সেটা জানা নেই। হেযবুত তওহীদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে পুরো মানবজাতিকে এই কথা মনে করিয়ে দেয়া

যে, "হে মানবজাতি! তোমরা পৃথিবীতে এমনি এমনি আসো নাই। একটা মহাপরিকল্পনার অংশ হিসাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, তিনি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা। তিনি আসমান-জমিন, গ্রহ-নক্ষত্র, পর্বতমালা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। তোমরা আল্লাহর খলিফা, আল্লাহর প্রতিনিধি। তোমরা সবাই এক বাবা-মা আদম হাওয়ার সন্তান। তোমরা সাদা-কালো, লম্বা-খাটো, আমেরিকান, বাঙ্গালি, ইন্ডিয়ান, তোমরা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান, ইয়াহুদি, নাস্তিক, মুর্তিপূজক- তোমরা যে-ই হও না কেন, হে মানুষ! তোমরা এক জাতি। তোমার প্রভু এক আল্লাহ। তোমার কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর খেলাফত করা। আজকে তোমাদের সমাজে এই অন্যায়, অশান্তি, জুলুম, রক্তপাত, এই হানাহানি, এই দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনা, শাসকের উপর শাসিতের জুলুম, নারীদের উপর অত্যাচার, শিশুদের হত্যাযজ্ঞ চলছে, আজকে দুনিয়াজোড়া যে অশান্তি চলছে, এই অশান্তির মূল কারণ তোমরা আল্লাহর খেলাফত বাদ দিয়েছ। তোমরা ইবলিসের দাসত্ব করছ, ইবলিসের হুকুম মানছ। মানবজাতির প্রতি আমাদের প্রথম বার্তা, প্রথম আহ্বান- হে মানুষ! তোমরা আসো, আল্লাহর তাওহীদের উপর আবার ঐক্যবদ্ধ হও। তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর খেলাফত করো।"

এবার মুসলমানদের উদ্দেশ্যে হেযবুত তওহীদের মূল আহ্বান, "হে মুসলমান! তোমরা নামাজ পড়ছ, রোজা রাখছ, হজ্ব করছ। তোমাদের কোনোকিছুর অভাব নেই। তোমাদের সংখ্যা ১৬০ কোটি। বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান অর্জন করছ তোমরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, ইবলিসের প্ররোচনায় তোমরা আল্লাহর তওহীদ থেকে সরে গিয়েছ। তওহীদের যে মূল কথা ছিল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ - মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ (স.), আল্লাহর হুকুম বিধান ছাড়া আমরা আর কারো হুকুম বিধান মানব না' এই অঙ্গীকারে আজকে মুসলমানরা নেই। মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে এই অঙ্গীকারে ফিরে আসা। মানবজাতি যেন আল্লাহর হুকুম মানতে পারে, আল্লাহর দাসত্ব করতে পারে, আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারে, এই পৃথিবীতে যেন অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ রক্তপাত না হয়, অভাব অনটন যেন না হয়, নিরাপত্তাহীনতা যেন না হয়- এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যুগে যুগে নবী ও রসুল পাঠিয়েছেন। তিনি এ অঙ্গীকার বাবা আদমের সঙ্গে করেছিলেন যে, "আমি হেদায়াহ দিব। যারা আমার হেদায়াহ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই। তাদের কোনো চিন্তা নেই (সুরা বাকারা ৩৯)"। এই হেদায়াহ হচ্ছে সঠিক পথ নির্দেশনা (Right Direction), গন্তব্যে যাওয়ার জন্য সঠিক পথ। এই সঠিক পথটা হচ্ছে আল্লাহর বিধান ছাড়া কারো বিধান না মানা, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ছাড়া কারো সার্বভৌমত্ব না মানা। সেটারই সংক্ষিপ্ত নামটাই হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এটা হচ্ছে বান্দার সঙ্গে আল্লাহর একটা চুক্তি (Contract)। বান্দা যদি মৃত্যু পর্যন্ত এ চুক্তিতে অটল থাকে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা অঙ্গীকার করেছেন যে তিনি তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। এই কথাটি বোখারি, মুসলিম, তিরমিজিসহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থের ঈমান অধ্যায়ের অধিকাংশ হাদিসে রয়েছে। এই হেদায়াহ, সঠিক পথের দিকনির্দেশনা আজকে নেই। জাতি শতধাবিভক্ত হয়ে একেক পথে চলছে। এটা আমাদের কথা না, নবী করিম (স.) বলেছেন, 'ইসলাম শুধু নাম থাকবে, কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে। মসজিদসমূহ হবে লোকে লোকারণ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ কিন্তু সেখানে হেদায়াহ থাকবে না। আমার উম্মাহর আলেমরা হবে আসমানের নিচে নিকৃষ্টতম জীব। তাদের সৃষ্ট ফেতনা তাদের দিকেই ধাবিত হবে (আলি রা. থেকে বায়হাকি, মেশকাত)।

আজকে ইসলাম শুধু নাম আছে। মুসলমান আছে ১৮০ কোটি, যারা কেবল ধর্মপরিচয়ে মুসলমান। আজকে কোর'আনের অক্ষর পড়া হচ্ছে, মুখস্থ করা হচ্ছে, তফসির করা হচ্ছে। রসুল বুঝিয়েছেন যে কোর'আনের বাস্তবায়ন হবে না, হুকুম পালন হবে না। কোর'আনের আদেশ মোতাবেক জাতি চলবে না। আজ ঠিক সেটাই হচ্ছে। জাতি কোর'আনের অক্ষর পাঠ করছে সওয়াবের উদ্দেশ্যে, কিন্তু বাস্তবে কোর'আনের হুকুমের বদলে কায়েম করছে ইবলিসের হুকুম, তাগুতের হুকুম, গায়রুল্লাহর হুকুম, পাশ্চাত্য সভ্যতার হুকুম। আল্লাহর রসুল বলে গেছেন মসজিদগুলি হবে লোকে লোকারণ্য কিন্তু সেখানে হেদায়াহ থাকবে না। বাস্তবেও আজকে হেদায়াহ নেই। সুরা ফাতেহার মধ্যে প্রতি ওয়াক্তে আমরা দোয়া করি, 'ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম - সরল পথে আমাদের হেদায়াহ দাও।' প্রতি ওয়াক্তে সালাতে আমরা হেদায়াতের প্রার্থনা করি, কিন্তু আজকে পৃথিবীতে সেই হেদায়াহই নেই। হেদায়াহ না থাকার কারণে সকলের সমস্ত এলেম ও আমল বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। এই হেদায়াহ, এই পথ নির্দেশনা নিয়ে আজকে পথে নেমেছে হেযবুত তওহীদ।

অর্থের বিনিময়ে তারাবিঃ আলেমগণের অভিমত

আতাহার হোসাইন

ধর্ম থেকে ত্যাগের শিক্ষাগুলো বিদায় নিয়েছে বহু আগে। সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে জীবন ও সম্পদ দুটোই ত্যাগ করা লাগে। তাই জেহাদ পরিত্যাগ করা হয়েছে বহু আগেই। বিকল্প হিসাবে প্রচার করা হয়েছে, তাৎপর্যপূর্ণ বলে উপস্থাপন করা হয় এবং এই দিবসগুলোকে ঘিরে ওয়াজ মাহফিল, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি বিবিধ কর্মসূচিকে ইবাদত হিসাবে উপস্থাপন করে ধর্মব্যবসার পথ সুগম করা হয়।

আত্মার বিরুদ্ধে জেহাদই বড় জেহাদ। সুতরাং জীবন-সম্পদ আর ত্যাগ করার দরকার পড়ছে না। আনুষ্ঠানিকতা, আনন্দ-উপভোগের ক্ষেত্রগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ করে বাণিজ্যিক রূপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন দুটো ঈদ। ৬০/৭০ টাকা ফেতরা দিয়েই তারা সমাজের দরিদ্র মানুষের প্রতি তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করেন আর নিজেরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে আনন্দ উপভোগ করেন। রমজান মাস মানে সংযমের মাস নয়, বরং রং বেরঙের বাহারী ইফতার আয়োজনের মাস। এই মাসে খতম তারাবি পড়িয়ে হাফেজ সাহেবরা ভালো রোজগার করেন। ঈদুল আজহায় কোরবানি অর্থাৎ ত্যাগের নামে শুরু হয় বিত্ত প্রদর্শন আর গোশত খাওয়ার মহোৎসব। এগুলো ছাড়াও শবে বরাত, শবে মেরাজ ইত্যাদি দিবসগুলোও ধর্মীয় দিক থেকে অতি

বর্তমানে খতম তারাবির ব্যাপক প্রচলন ঘটানো হয়েছে যার অন্যতম কারণ বাণিজ্যিক। এত বড় কথা কেন বলছি? কারণ প্রথমত আল্লাহর রসুল কখনও খতম তারাবি করেন নি। তথাপি একে 'উত্তম বেদাত' হিসাবে সওমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে। কেন তা বিচার করার জন্য যে কারো সত্যনিষ্ঠ বিবেকই যথেষ্ট হবে। আয়াত গোপন করা ও এর বিনিময় গ্রহণ করাকে আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে হারাম করেছেন এবং এমন কারো অনুসরণ করার আদেশ করেছেন যিনি বিনিময় গ্রহণ করেন না এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত।[১] অধিকন্তু কোর'আন খতম ও খতম তারাবির বিনিময়গ্রহণ সম্পর্কে হাদিস ও ফতোয়ার

১. আল কোর'আন: সুরা ইয়াসীন ২১

গ্রন্থগুলোতে কী সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় সেটাও আমরা এখন দেখে নিতে চাই।

• বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে রসুলাল্লাহর (সা.) সিদ্ধান্ত

১. বিশিষ্ট সাহাবি আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা.) বলেন, আমি রসুলাল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা কোর'আন পড় তবে তাতে বাড়াবাড়ি করো না এবং তার প্রতি বিরূপ হয়ো না। কোর'আনের বিনিময় ভক্ষণ করো না এবং এর দ্বারা সম্পদ কামনা করো না।'[১]

জীবনের প্রতিটি বিষয়ের মতো কোর'আন পড়ার মধ্যেও রসুলাল্লাহ পরিমিতিবোধ বজায় রাখতে বলেছেন। কারণ দীর্ঘ সময় কোর'আন পাঠ করলে পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের মধ্যেই বিরক্তিভাব বা ক্লান্তি বা অমনোযোগ চলে আসতে পারে যা কোর'আনের জন্য মর্যাদাহানিকর। তাই তিনি এই বাড়াবাড়িটা করতে নিষেধ করেছেন। পাশাপাশি কোর'আন পাঠের বিনিময় ভক্ষণ করতে, এমনকি মনে মনে সম্পদ কামনা করতেও নিষেধ করেছেন।

২. রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে কেউ কোর'আন পড়ে সে যেন তা দিয়ে আল্লাহর কাছে চায়। এরপর এমন কিছু মানুষ আসবে যারা কোর'আন পড়ে তার বিনিময় মানুষের কাছে চাইবে।[২]

৩. অর্থের বিনিময়ে কোর'আন খতমের যে ধারা আমাদের সমাজে চালু হয়েছে সে বিষয়ে রসুলাল্লাহর একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, একদিন আমরা একদল লোক এক স্থানে সমবেত ছিলাম। আমাদের মধ্যে আরব, অনারব, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সকল শ্রেণির লোকই ছিল। এ অবস্থায় নবী করিম (সা.) আমাদের মধ্যে আগমন করে বললেন, "তোমরা সৌভাগ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছ। তোমরা আল্লাহর কেতাব তেলাওয়াত করে থাক। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসুল বর্তমান রয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের নিকট এইরূপ এক যুগ আসবে যখন তীরের ফলক বা দণ্ড যেরূপ সরল ও সোজা করা হয়, লোকেরা কোর'আন তেলাওয়াতকে ঠিক সেইরূপ সরল ও সোজা করবে। তারা দ্রুত তেলাওয়াত করে নিজেদের পারিশ্রমিক আদায় করবে এবং এর জন্য তাদের বিলম্ব সহ্য হবে না।[৩]

• বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে আসহাবে রসুলগণ ও তাবেয়ীনদের সিদ্ধান্ত

১. রসুলাল্লাহর সাহাবিরা তাই কখনোই কোর'আন পাঠ বা শিক্ষাদানের বিনিময় গ্রহণ করতেন না, একে আগুনের মতো ভয় করতেন। তারা সবসময় আশঙ্কায় থাকতেন যে কোনোভাবে ইসলামের কাজের বিনিময়ে সম্পদ গ্রহণ করে ফেলেন কিনা। কারণ তারা ইসলামের যাবতীয় কাজ করতেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। পার্থিব জীবনযাপনের চাহিদা মেটাতে তারা হালাল পথে পরিশ্রম করে রোজগার করতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আব্দাল্লাহ ইবনে মা'কাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক রমজানে লোকদের নিয়ে তারাবি পড়ালেন। এরপর ঈদের দিন উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তাঁর কাছে এক জোড়া কাপড় এবং ৫০০ দিরহাম পাঠালেন। তখন তিনি কাপড় জোড়া এবং দিরহামগুলো এই বলে ফেরত দিলেন, আমরা কোর'আনের বিনিময় গ্রহণ করি না।[৪]

২. তাবেয়ী যাযান (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি কোর'আন পড়ে মানুষ থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করে, সে যখন হাশরের মাঠে উঠবে তখন তার চেহারায় কোনো গোশত থাকবে না, শুধু হাড্ডি থাকবে।[৫]

• বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে ফকিহ ও ইমামদের সিদ্ধান্ত

এবার দেখা যাক ইসলামের বিশেষজ্ঞ ও ইমামগণ এই ব্যাপারে কী ফায়সালা দিয়েছেন। পূর্ববর্তী আলেম-ওলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, খতমে তারাবির বিনিময় দেওয়া-নেওয়া উভয়ই নাজায়েজ ও হারাম। হাদিয়া হিসেবে দিলেও জায়েজ হবে না।

১. হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, বিনিময় লেনদেন হয় এমন খতম তারাবি শরিয়তপরিপন্থী। এরূপ খতমের দ্বারা সওয়াবের অংশীদার হওয়া যাবে না বরং গোনাহের কারণ হবে।[৬]

২. দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠানটি উপমহাদেশে কোর'আন হেফজ করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। তাদের ফতোয়ার একটি গ্রহণযোগ্যতা আলেম সমাজে রয়েছে। এই দারুল উলুম কর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়াতেও আমরা দেখি খতম তারাবির বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ না-জায়েজ। হযরত মুফতি আজিজুর রহমান (রহ.) বলেন, বিনিময় গ্রহণ করে কোর'আন শরিফ তেলাওয়াত করা জায়েজ নেই। যাদের নিয়তে দেওয়া-

১. হাদিস: মুসনাদে আহমদ ৩/৪২৮; মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৫/২৪০; কিতাবুত তারাবীহ।
২. হাদিস: তিরমিযি/২৯১৭
৩. হাদিস: মুসনাদে আহমদ, তাফসির ইবনে কাসীর।
৪. মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৫/২৩৭, হাদিস: ৭৮২১
৫. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদিস: ৭৮২৪
৬. এমদাদুল ফতোয়া ১/৪৮।

নেওয়া আছে, তাও বিনিময়ের হুকুমে হবে। এমতাবস্থায় শুধু তারাবি আদায় করাই ভালো। বিনিময়ের কোর'আন তেলাওয়াত না শোনা উত্তম। কিয়ামুল লাইলের সওয়াব শুধু তারাবি পড়লেই অর্জন হয়ে যাবে।[১]

৬. দারুল ইফতাহ ও দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া রয়েছে - যে হাফেজ সাহেব টাকার লোভে

৩. তারাবিতে কোর'আন পড়ার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই। দানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়েই গোনাহগার হবে। যদি বিনিময়বিহীন কোর'আন শোনানোর মতো হাফেজ পাওয়া না যায়, তবে ছোট ছোট সুরা দিয়ে তারাবি পড়ে নেওয়াই উত্তম।[২]

৪. দেওবন্দি আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারি হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) স্বয়ং বলেছেন, তারাবিতে যে পবিত্র কোর'আন পড়ে এবং যে শোনে তাদের মধ্যে অর্থের বিনিময় হারাম। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া- ৩৯২) আমাদের দেশের অধিকাংশ কোর'আনে হাফেজগণই এই দারুল উলুম দেওবন্দের ভাবধারায় পরিচালিত কওমী মাদ্রাসার ছাত্র। তারা এই ফতোয়াগুলোর কতটুকু মূল্যায়ন করছেন?

৫. আহলে হাদিস মতাদর্শের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব মাওলানা আব্দুল্লাহ অমৃতসরী লিখেছেন, বিনিময়ের মাধ্যমে তারাবিতে পবিত্র কোর'আন তিলাওয়াত করা বা বিনিময় নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ হারাম। বরং এরূপ লোকের পেছনে তারাবিও হয় না।[৩]

কোর'আন মজিদ শোনান তা শোনার চেয়ে যে সুরা তারাবি আদায় করে তার মুক্তাদি হওয়া ভাল। যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোর'আন শোনানো হয় তাহলে ইমামের সওয়াব হবে না, মুক্তাদিরও সওয়াব হবে না।[৪]

৭. বিনিময় দিয়ে কোর'আন খতম শুনে তারাবি আদায় করার চেয়ে সুরা তারাবি আদায় করাকেই অনেক আলেম আমলের দিক থেকে উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। শায়েখ মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) বলেছেন, "ছোট ছোট সুরা দিয়ে তারাবি পড়ে নিন। বিনিময় দিয়ে কোর'আন শুনবেন না। কারণ কোর'আন শোনানোর মাধ্যমে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই।[৫]

৮. বিনিময় নিয়ে তারাবি নামাজে ইমামতকারী ইমামের ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (র.) বলেন, আমি বিনিময় নিয়ে নামাজ পড়ানোকে মাকরুহ মনে করি এবং আমার ভয়

১. ফতোওয়া দারুল উলুম ৪/২৪৬
২. ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া ৭/১৭১
৩. ফতোয়ায়ে আহলে হাদিস ২/৩০২
৪. দারুল ইফতাহ ও দারুল উলুম দেওবন্দ
৫. জাওয়াহেরুল ফিকহ ১/৩৮২

হয়, ওই সব লোকের নামাজ আবার পড়তে হবে কি না, যারা এমন ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করেন। এরপর তিনি বলেন, আমার মত হলো, বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না।[১]

৯. হযরত খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) বলেন, বিনিময় দিয়ে পবিত্র কোর'আন শোনা জায়েজ নয়। দানকারী এবং গ্রহণকারী উভয় গোনাহগার হবে।[২]

১০. মুফতি কেফায়াতুল্লাহ (রহ.) বলেন, তারাবিতে পবিত্র কোর'আন শোনানোর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই।[৩]

১১. খেদমতের নামে নগদ টাকা বা কাপড়চোপড় ইত্যাদি দেওয়াও বিনিময়ের মধ্যে শামিল। বরং তা বিনিময় ধার্য করা থেকেও জঘন্য। কারণ তাতে দুটি গোনাহ একত্রিত হয়। একটি কোর'আনের বিনিময় গ্রহণের গোনাহ। দ্বিতীয়টি হলো, যে বিনিময় হচ্ছে তা না জানার গোনাহ।[৪]

১২. বিশিষ্ট বেরলভি মুফতি আমজাদ আলী কাদেরী আজমী এক ফতোয়ায় লেখেন, বর্তমানে অধিক প্রচলন দেখা যায়, হাফেজ সাহেবকে বিনিময় দিয়ে তারাবি পড়া হয়- যা জায়েজ নেই। দানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ই গোনাহগার হয়। এটুকু নেব বা এটুকু দেবে- এটিই শুধু বিনিময় নয়। বরং যদি জানা থাকে যে এখানে কিছু পাওয়া যায়, যদিও তা নির্দিষ্ট নয়, তা নাজায়েজ। কারণ জানা থাকাও শর্তকৃতের মতো।[৫]

১৩. লা-মাজহাবিদের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী লেখেন, ইমাম আহদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর কাছে বিনিময় নিয়ে তারাবি নামাজে ইমামতকারী ইমামের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, সেরূপ ইমামের পেছনে কে বা কারা নামাজ আদায় করবে? [৬]

• বিনিময় নেবার পক্ষের কলাকৌশলঃ

উল্লেখ্য যে, এত স্পষ্ট, দালিলিক অভিমত থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে কোনো কোনো আলেম তারাবিহ পড়িয়ে বিনিময় গ্রহণ করাকে 'বৈধ' বলে থাকেন। অনেকে আবার স্বীকার করেন যে, বিনিময় নেওয়া বৈধ হবে না, তবে যেহেতু হাদিয়া বা পারিশ্রমিক না দিলে পরের বছর আর হাফেজ পাওয়া যাবে না, তাই 'হিলা' বা কৌশল অবলম্বনের পক্ষে মতামত দেন তারা। এক্ষেত্রে আল্লামা আব্দুর রহীম লাজপুরী (র.) একটি পন্থা বাতলে দিয়েছেন তা হলো- রমজানে হাফেজকে নিয়োগ দেয়ার সময় এক মাসের জন্য সহকারী ইমাম হিসেবে নিয়োগ দিবে এবং হাফেজকে প্রতিদিন মসজিদে তারাবীহ ছাড়াও এক দুই ওয়াক্তের ইমামতির দায়িত্ব দিবে এবং ফরদ নামাজের ইমামতির উপর ভিত্তি করে তাকে হাদিয়া দেয়া হবে। মুফতী কেফায়াতল্লাহ (র.) ও মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী (র.) এই কৌশলটিকে জায়েজ বলেছেন।[৭] কিন্তু এই ফতোয়াটির যৌক্তিকতা নিয়ে অন্যান্য আলেমরা প্রশ্ন তুলে থাকেন। তাদের মতে, এটি একটি বাহানা মাত্র। কারণ যদি ওই হাফেজ সাহেব তার দায়িত্বে অর্পিত ফরজ নামাজের ইমামতি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গেও আদায় করেন আর খতম তারাবিতে অংশগ্রহণ না করেন তাহলে আর যা-ই হোক তাকে ওই বিনিময় দেয়া হবে না, যা খতম তারাবি পড়ালে দেয়া হত। এতেই বোঝা যায় বিনিময়টি মূলত খতম তারাবির, ফরজের ইমামতির নয়। এ জন্যই তারা এই হিলা অবলম্বনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৮]

এই নিবন্ধে আমরা কোর'আন, হাদিস ও প্রসিদ্ধ আলেমদের ফতোয়ার গ্রন্থ থেকে কিছু দলিল তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ সমস্ত দলিল ও যুক্তিপ্রমাণের আলোকে যেন মুসলিম উম্মাহ সঠিকভাবে চিন্তা করার পথ খুঁজে পায় সেটাই এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য। একটি ভুলের চর্চা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে বলে সেটাকে অনন্তকাল চালিয়ে যেতে হবে এমন ধারণা থেকে আমাদের সবার বেরিয়ে আসা উচিত। ধর্মব্যবসা ধর্মের ধ্বংস ডেকে আনে, এই সরল কথাটি সকলেই জানেন ও বোঝেন। এখন প্রয়োজন ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ অবস্থান। তাহলেই আমরা আবার আমাদের হারানো গৌরবের দিন ফিরে পেতে পারি।

লেখক, কলামিস্ট ও ব্লগার

১. ফতোয়ায়ে নজিরিয়া ১/৬৪২
২. ফতোয়ায়ে খলিলিয়া ১/৪৮
৩. কেফায়াতুল মুফতি ৩/২৬৫
৪. আহসানুল ফতোওয়া ৩/৫১৪
৫. বেরলভি সম্প্রদায়ের ফতোয়াগ্রন্থবাহারে শরিয়ত ৪/৬৯২
৬. লা-মাজহাবি সম্প্রদায়ের ফতোয়া
৭. ফাতোয়ায়ে রহীমিয়া-৬/২৩৫/২৪৬
৮. ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৩২২; ইমদাদুল আহকাম ১/৬৬৪

রমজানের খাদ্যাভ্যাস

ডা. মোহাম্মদ জাকারিয়া হাবিব

মাহে রমজান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য এক অনন্য উপহার। সংযম আর সাধনার এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন হয় এই মাসে। তবে পবিত্র রমজানে আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। এ সময় খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। অনেকেই আমরা নিয়মিত খাদ্যাভাস এবং বিভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের কারণে প্রতিদিনের কর্মপদ্ধতি থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জটিলতার মুখোমুখি হই।

সারাদিন সাওম রাখার পর ইফতারে শরীরের জন্য কি কি খাবার উপকারী কিংবা সেহরিতে কি খেলে আপনি নির্ভাবনায় কাটিয়ে দিতে পারবেন আসুন সেটা জানার চেষ্টা করি।

প্রতিদিন আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, সেহরিতে সেসব খাদ্য গ্রহণের উপর জোর দিতে হবে। যেহেতু সারাদিন আর খাওয়া হয় না তাই শর্করা জাতীয় খাবার বেশি খাওয়া উচিত। ভাতের সাথে রুটি, আলু দিয়ে তৈরি খাবারে প্রচুর পরিমাণে শর্করা থাকে। খাবারের পর কিছু ফলমূল খাওয়া যেতে পারে। হতে পারে দুধ কিংবা ফলের রস। তেমনি সারাদিন না খেয়ে থাকার পর ইফতারে হঠাৎ করে ভাজাপোড়া খাবার পাকস্থলীতে হজম করতে কষ্ট হয়। খেজুর প্রাণশক্তিতে ভরপুর একটি খাবার। তাই ইফতারে খেজুর খাওয়া খুব ভালো। প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে সারাদিন শরীরে পানিশূন্যতা দূর করার জন্য।

রমজান মাসে খাদ্যাভাসের সাথে দৈনন্দিন জীবনযাপনের হঠাৎ বেশ পরিবর্তন হয়। যেহেতু কোনো কিছু দিনের বেলায় খাবার গ্রহণের বিষয় থাকে না তাই পানীয় খাওয়া হয় না। তাই ইফতারের পর কিংবা দিনের যে কোনো সময় শরীরে পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে। ঘাম এবং প্রস্রাবের সাথে যে পরিমাণ পানি শরীর থেকে বের হয়ে যায়, তা ইফতারের পর পূরণ করতে বেশি পরিমাণে পানি এবং ফলের জুস খাওয়া যেতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষ্যমতে, রোগের জটিলতা অনুসারে নির্ধারিত হয় রোগী সাওম পালন করতে পারবেন কি পারবেন না। যদি কোনো গর্ভবতী মা এবং তার পরিবার সাথে সাথে ডায়াবেটিক রোগীরা বিশেষভাবে চিন্তিত থাকেন সাওম পালন করতে পারবেন কিনা এবং কি নিয়ম অনুসরণ করবেন তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ নির্দেশনা।

সাওম রাখার ফলে আমাদের শরীরে জমে থাকা ক্ষতিকারক টক্সিন বা বিষ দেহ থেকে বের হয়ে যায় এবং সাথে সাথে পরিপাকতন্ত্রের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে উপকার হয় গ্যাস্ট্রিক আলসার রোগীদের। একমাস সাওম পালন করার ফলে তাদের এই রোগটি অনেকটা সেরে যায়। সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণ থাকে উচ্চ রক্তচাপ যাদের রয়েছে। গর্ভবতী মায়েরা গর্ভকালীন সময়ে ঘন ঘন বমি করার কারণে সাওম পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে। যদি মা সুস্থ অনুভব করেন তাহলে সাওম পালন করতে পারেন।

সাওম পালনের মাধ্যমে পানাহারের নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এতে অনেক রোগ দূর হয়। স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এইজন্য বোধ হয় মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ব্যক্ত করেছেন, সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানতে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৪-১৮৫ ।

অতএব সঠিকভাবে খাদ্যাভাস এবং নিয়ম অনুসারে চললে সাওম পালনে কোনো অসুবিধা হয় না তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না।

সহকারী বার্তা সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে

ইসলামের উদ্দেশ্য কী?

মানুষ মূলত সামাজিক জীব এবং সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। তার কারণ কোনো মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, জীবনধারণের জন্য তাকে কোনো না কোনো কারণে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতেই হয়, নির্ভরশীলতার কারণেই তাকে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে হয়। সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে গেলে মানুষকে স্বভাবতই একটি নিয়ম-কানুনের অর্থাৎ System-এর মধ্যেই বাস করতে হয়। যে System-এর মধ্যে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের নিয়ামক থাকতে হয়। এই System বা নিয়ামককে জীবনব্যবস্থা বলা যায়। স্বভাবতই সেই জীবনব্যবস্থায় একদিকে যেমন থাকবে আত্মিক উন্নয়নের ব্যবস্থা অন্যদিকে আইন কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি সর্বপ্রকার ও সর্ববিষয়ে বিধানও থাকতে হবে।

একটি জীবনব্যবস্থা ছাড়া সমাজবদ্ধ জীবের বাস করা বা জীবন যাপন করা একেবারেই অসম্ভব। মানুষের কাছে কাম্য হচ্ছে এমন একটি জীবনব্যবস্থার মধ্যে সে বাস করবে, যে জীবনব্যবস্থাটি হবে সঠিক ও নির্ভুল; সেই ব্যবস্থা কার্যকর করার ফলে মানুষ এমন একটি সমাজে বাস করবে যেখানে কোনো অন্যায় থাকবে না, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোনো প্রকার অন্যায় থাকবে না, অবিচার থাকবে না, যেখানে জীবন এবং সম্পদের নিরাপত্তা হবে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত; যেখানে চিন্তা, বাক-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হবে সংরক্ষিত এবং মানুষে মানুষে সংঘাত, দ্বন্দ্ব, রক্তপাত থাকবে না। অবশ্য যেহেতু মানবজাতির মধ্যে ভালো-মন্দ সব রকম লোকই থাকে, সেহেতু এটা ১০০% অর্জন করা সম্ভব নয়, কিন্তু জীবনব্যবস্থার নির্ভুলতা বা সঠিকতার ফলে যদি অপরাধ, অন্যায়, অবিচার এবং মানুষে মানুষে সংঘর্ষ ও রক্তপাত নিম্নতম পর্যায়ে, শতকরা ১% বা ২% এ নেমে আসে, তবে তা-ই যথেষ্ট। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন একটি সঠিক, নির্ভুল জীবন-বিধান কোথায় পাওয়া যাবে?

এই বিশাল বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহ মানুষ জাতি সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতির স্রষ্টা কি জানতেন না তিনি যে সামাজিক জীব সৃষ্টি করলেন তার জন্য একটি নিখুঁত জীবনব্যবস্থাও প্রয়োজন? না হলে তাঁর সৃষ্ট ঐ জীব অর্থাৎ মানুষ জাতি নৈরাজ্যের মধ্যে বাস করতে বাধ্য হবে? সুতরাং তিনি অবশ্যই মানুষকে তা দান করেছেন। আল্লাহর প্রদত্ত এই জীবনব্যবস্থারই নাম হচ্ছে দীন বা দীনুল হক অর্থাৎ সত্য দীন। মানবজাতি যদি কোনো কারণে এটিকে গ্রহণ এবং তাদের জীবনে কার্যকর না করে তবে অবশ্যই তাকে নতুনভাবে অন্য একটি জীবনব্যবস্থা তৈরি, প্রণয়ন করতেই হবে। কারণ একটি জীবনব্যবস্থা অর্থাৎ System ছাড়া পৃথিবীতে বাস করা মানবজাতির জন্য অসম্ভব। এই প্রণয়নের ভিত্তি হতে হবে মানুষের বুদ্ধি, মেধা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা।

মানবজাতির সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ। একটি হল, স্রষ্টার দেওয়া নিখুঁত ত্রুটিহীন জীবনব্যবস্থা যেটি মানবজীবনে, আমাদের জীবনে কার্যকর করলে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা, অপরাধ, সংঘর্ষ, রক্তপাত প্রায় বিলুপ্ত হয়ে নিরাপদ ও শান্তিময় জীবন আমরা পাবো। এই শান্তিময় অবস্থাটির নামই স্রষ্টা দিয়েছেন ইসলাম, অর্থাৎ শান্তি।

দ্বিতীয় পথটি হল, স্রষ্টার দেওয়া জীবনবিধান (দীন) প্রত্যাখ্যান করলে মানবজাতিকে অবশ্যই নিজেদের জীবনবিধান নিজেদেরই তৈরি করে নিতে হবে। কারণ যেমনটি পেছনে বলে এসেছি, সামাজিক জীব মানুষের জীবনবিধান ছাড়া চলা অসম্ভব। স্বভাবতই এই জীবনবিধান নির্ভুল ও ত্রুটিহীন হওয়া সম্ভব নয়। যার ফলে সমাজ জীবনে নৈরাজ্য, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, সংঘর্ষ, রক্তপাত, নিরাপত্তাহীনতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। বর্তমানে মানবজাতি এই দ্বিতীয় পথটিকেই গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের জীবনবিধান দিয়ে তাদের জীবন পরিচালিত করছে এবং ফলে মানুষের জীবন অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা, অপরাধ, সংঘর্ষ, রক্তপাতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

মানুষের তৈরি করা বিভিন্ন রকম জীবনব্যবস্থা একটা একটা করে প্রয়োগ করে দেখা হয়েছে। রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে গেছে। এর প্রত্যেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। এখন অধিকাংশ সমাজে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পরীক্ষা চলছে। এরও ফল আমরা দেখছি। সমস্ত পৃথিবী আজ গত এক বা দুই শতাব্দী আগের চেয়ে অনেক বেশি অন্যায় এবং অবিচারে পূর্ণ। গরীব ও ধনীর ব্যবধান

অনেক বেশি প্রকট। মানুষে মানুষে সংঘর্ষ ও রক্তপাত বহুগুণে বেশি। গত এক শতাব্দিতেই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ করে কোটি কোটি লোক হতাহত হয়েছে। এই নতুন শতাব্দির প্রথম দশকের একটি দিনও যায় নাই যেদিন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও যুদ্ধ, রক্তপাত চলে নাই। মানব জাতির এই অবস্থায় এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, সবগুলি জীবনব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ার পর স্রষ্টার দেওয়া জীবন বিধান মেনে নেওয়া ছাড়া শান্তি ও নিরাপত্তার আর কোনো পথ নেই।

প্রশ্ন হতে পারে যে, স্রষ্টার দেওয়া জীবনবিধান মানুষের সমাজ জীবনে প্রয়োগ ও কার্যকর করা হলে জীবনে যে ন্যায়, সুবিচার, নিরাপত্তা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হবে তার যুক্তি ও প্রমাণ কী যুক্তি স্বয়ং স্রষ্টা দিয়ে দিয়েছেন, যে যুক্তির বিরুদ্ধে কোনো জবাব নেই। তিনি বলছেন, 'যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মতম বিষয়ও জানেন।' আর প্রমাণও আছে, তা হল ইতিহাস। শেষ নবী মোহাম্মদের (দ.) মাধ্যমে যে শেষ জীবন বিধান স্রষ্টা প্রেরণ করেছিলেন তা মানবজাতির একাংশ গ্রহণ ও সমষ্টিগত জীবনে কার্যকর করার ফলে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি অংশ অর্থাৎ নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে কী ফল হয়েছিল তা ইতিহাস। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ণ নিরাপত্তা যাকে বলে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মানুষ রাতে শোওয়ার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত না, রাস্তায় ধনসম্পদ ফেলে রাখলেও তা পরে যেয়ে যথাস্থানে পাওয়া যেত, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানি প্রায় নির্মূল হয়ে গিয়েছিল, আদালতে মাসের পর মাস কোনো অপরাধ সংক্রান্ত মামলা আসতো না। আর অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিটি মানুষ স্বচ্ছল হয়ে গিয়েছিল। এই স্বচ্ছলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মানুষ যাকাত ও সদকা দেওয়ার জন্য টাকা পয়সা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো কিন্তু সেই টাকা গ্রহণ করার মত লোক পাওয়া যেত না। শহরে নগরে লোক না পেয়ে মানুষ মরুভূমির অভ্যন্তরে যাকাত দেওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াতো। এটি ইতিহাস। মানবরচিত কোনো জীবনব্যবস্থাই এর একটি ভগ্নাংশও মানবজাতিকে উপহার দিতে পারে নাই।

শান্তিময় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য সর্ব প্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হচ্ছে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা। তারপর ক্রমান্বয়ে আসে অর্থনৈতিক সুবিচার, তারপর ক্রমান্বয়ে আসে রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সুবিচার। এই প্রথমটি অর্থাৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে স্রষ্টা আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধানে যতটা গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তা বোঝার জন্য একটি ঘটনা গভীরভাবে বিবেচ্য। ঘটনাটি এই:-

একদিন মানবজীবনের জন্য স্রষ্টার দেওয়া জীবনবিধান বহনকারী শেষ রসুল মোহাম্মদ (দ.) কা'বা শরীফের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তখন সময়টা ছিল এমন যখন তিনি ও তাঁর সহচরগণের ওপর প্রচণ্ড বাধা এবং অবর্ণনীয় নির্যাতন নিপীড়ন চলছিল। হঠাৎ একজন সহচর (সাহাবা) বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এই অত্যাচার নিপীড়ন আর সহ্য হচ্ছে না। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আমাদের বিরোধীরা সব যেন ধ্বংস হয়ে যায়। কথাটাকে আল্লাহর রসুল কতখানি গুরুত্ব দিলেন তা বোঝা যায় এই থেকে যে, তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং ঐ সাহাবাকে বললেন, তুমি কী বললে? সাহাবা তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। শুনে আল্লাহর রসুল তাকে বললেন, 'শোন, শীঘ্রই সময় আসছে যখন কোনো যুবতী মেয়ে গায়ে গহনা পরে একা সা'না থেকে হাদরামাউদ যাবে। তার মনে এক আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া আর কোনো ভয় থাকবে না।' [হাদিস: খাব্বাব (রা.) থেকে বোখারি ও মেশকাত] এই ঘটনাটির মধ্যে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। প্রথমত, আল্লাহর রসুল উদাহরণস্বরূপ বললেন, স্ত্রী লোক, কোনো পুরুষের কথা বললেন না। কারণ স্ত্রী লোকের প্রাণ ও সম্পদ ছাড়াও আরও একটি জিনিস হারাবার সম্ভাবনা আছে যা পুরুষের নেই। সেটা হল ইয্যত, সতীত্ব, মান-সম্ভ্রম। দ্বিতীয়ত, ঐ স্ত্রী লোক বয়সে যুবতী। অর্থাৎ আরও লোভনীয়। তৃতীয়ত, অলঙ্কার গহনা পরিহিত, চোর ডাকাতের জন্য লোভনীয়। এতগুলো লোভনীয় বিষয় থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর রসুল বলছেন, অনুরূপ একটি অলঙ্কার পরিহিত যুবতী স্ত্রীলোক একা সা'না শহর থেকে সাড়ে তিনশ' মাইল দূরবর্তী হাদরামাউতে যেতে, যা অন্তত কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার, এত দীর্ঘ পথে আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া কোনো ভয় করবে না। চতুর্থত, লক্ষ্য করার বিষয়, স্ত্রীলোকটি শুধু পথের নিরাপত্তা সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত হবে না, আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া অন্য কোনো রকম বিপদের কোনো আশঙ্কাই তার থাকবে না। চিন্তা করে দেখুন, একটি সমাজের নিরাপত্তা কোন পর্যায়ে গেলে অনুরূপ অবস্থায় একটি স্ত্রীলোকের মনে আল্লাহ এবং বন্য পশু ছাড়া আর কোনো ভয়ই থাকে না।

এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই জীবনব্যবস্থার (দীন) প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বর্তমান দীনের উদ্দেশ্যের (আকীদা) বিরাট তফাৎও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। প্রকৃত ইসলামের,

জীবনব্যবস্থার উদ্দেশ্য মানবজীবনের নিরাপত্তা, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আর বর্তমানের ইসলামের উদ্দেশ্য ওসব কিছুই নয় বরং সময়মত নামাজ পড়া, যাকাত দেওয়া, হজ করা, রোজা রাখা, দাড়ি রাখা, লম্বা পোশাক ও খাঁটো পায়জামা পরা ইত্যাদি। অর্থাৎ শুধুমাত্র কিছু আমল করে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করা। কিন্তু আমলের আগে হচ্ছে ঈমান। সেই ঈমানের দাবি বা শর্ত হচ্ছে, আল্লাহর দেওয়া হুকুম বিধান ছাড়া অন্য কারো হুকুম বিধান না মানা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)। যদি আল্লাহর হুকুম বিধান জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানা হয় তবে শান্তি অনিবার্য। সমাজে, রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার এই আকিদাই আজকে নাই। কিছু আমল আখলাক করে দিন পার করে দেওয়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানের এই আকীদাই যদি সঠিক হত তবে আল্লাহর রসুল তাঁর সাহাবার কথার উত্তরে শীঘ্রই সেই অভূতপূর্ব নিরাপত্তা আসছে এ কথা না বলে বলতেন, অতি শীঘ্রই সময় আসছে যখন মানুষ দলে দলে মসজিদে নামাজ পড়তে যাবে, হজ করবে, রোজা রাখবে, লম্বা লম্বা দাড়ি রাখবে, যেকের করবে, লম্বা জোব্বা আর খাঁটো পায়জামা পরবে।

স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে বর্তমানে মানবজাতি যে বিভিন্ন জীবনব্যবস্থা নিজেরা চিন্তাভাবনা করে তৈরি করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তা তাদের জীবনে কার্যকর করছে তার ফল আমরা কী দেখছি? প্রথমটাই ধরা যাক, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা। এর অবস্থা যতই দিন যাচ্ছে সর্বত্রই ক্রমান্বয়ে খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। ধনী উন্নত বিশ্ব তাদের যার যার দেশে খুন, জখম, রাহাজানি, অপহরণ, ধর্ষণ, প্রতারণা ইত্যাদি সমস্ত অপরাধ দমন, অন্ততপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিস, গোয়েন্দা বিভাগ, ফরেনসিক সাইন্স (Forensic Science) ইত্যাদির উন্নয়ন ও অপরাধ দমনের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় করছে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। এই সব উন্নত দেশে প্রতি ঘণ্টায় বিভিন্ন অপরাধের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সরকারগুলির আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ জগতের অপরাধীরাও সমান পাল্লা দিয়ে চলছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সরকারও তাদের দারিদ্র্য ও অনুন্নত প্রযুক্তি নিয়ে অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে তেমন কিছুই করতে পারছেন না। এ দেশগুলিতেও অপরাধের মাত্রা উন্নত দেশগুলির মতই ধাঁ-ধাঁ করে বেড়ে চলছে।

শেষ রসুলের মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা মানবজাতির একটি অংশে প্রয়োগ ও কার্যকর করার ফল কী হয়েছিল তা একবার দেখা যাক। যারা আমার এই লেখা পড়ছেন, তাদের অনুরোধ করছি আপনারা মনে মনে কয়েক কোটি মানুষ নিয়ে গঠিত একটি সমাজ কল্পনা করুন। কল্পনা করুন এই সমাজে অস্ত্র কিনতে বা তৈরি করতে কোনো বাধা নেই, কোনো লাইসেন্স প্রয়োজন পড়ে না, যে কেউ অস্ত্র কিনে বা তৈরি করে তার ঘর ভরে ফেললেও কেউ তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলে না। কল্পনা করুন, এই সমাজে কোনো আইন শৃংখলা রক্ষাকারী অর্থাৎ পুলিস বাহিনী নেই। বর্তমানের মত হাজার হাজার লোক রাখার উপযোগী কোনো জেলখানাও সেখানে নেই। শুধু বড় বড় শহরগুলিতে দুই-চারজন লোক রাখার মত ছোট জেলখানা আছে। কিন্তু সমাজে বলতে গেলে কোনো অপরাধ নেই। বিচারালয়গুলিতে অপরাধ সংক্রান্ত মামলা প্রায় অনুপস্থিত। আমি জানি, এমন একটি সমাজ কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আমার আরজ হচ্ছে, আপনারা যা কল্পনা করতে পারছেন না, তা ইতিহাস। আল্লাহর রসুলের জাতি গঠন থেকে শুরু করে এই জাতির আদর্শচ্যুতি ও ফলে পতন আরম্ভ হওয়ার সময় পর্যন্ত বহু বছর ধরে এই অবস্থা বিরাজ করেছিল। অস্ত্রের মালিকানা, অস্ত্র তৈরি ও বিক্রয়ের উপর সামান্যতম কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকা সত্ত্বেও, দেশে কোনো পুলিসবাহিনীর উপস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও অপরাধের মাত্রা প্রায় শূন্যের কোঠায় ছিল। এই অকল্পনীয় অবস্থা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? এর একমাত্র কারণ, মানুষ মানব রচিত সকল ব্যবস্থা, বিধান প্রত্যাখ্যান করে তার স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ ও জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে সামগ্রিকভাবে প্রয়োগ করেছিল অর্থাৎ 'লা- ইলাহা এল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া আর কারও বিধান গ্রহণ করি না' এই মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করেছিল।

এখন মানুষ রচিত সর্বরকম ব্যবস্থা, তন্ত্র (Ism) ব্যর্থ হবার পর স্রষ্টা আল্লাহর দেওয়া দীন (জীবনব্যবস্থা) আবার কার্যকর করে দেখা ছাড়া আর কী পথ বাকী আছে?

[এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে ঈষৎ সম্পাদিত]

রোজায় পানির ঘাটতিতে ফ্রুট শেক

করোনাকালে রোজায় পানির ঘাটতি মিটিয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে একদিকে ভ্যাপসা গরম। আর এই গরমে হচ্ছে রোজা। রমজানে দীর্ঘ সময় না খেয়ে থেকে শরীরে পানির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সন্ধ্যায় ইফতারে পানি পান করেও যেন ঠাণ্ডা হচ্ছে না শরীর। সারাদিনই ক্লান্ত লাগে। রোজায় আদ্রতা ধরে রেখে ক্লান্তি কাটাতে ও মহামারি করোনার সময়ে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ইফতারে পান করতে পারেন ফ্রুট শেক। লেবুর সরবত তো সব সময়ই করা হয়। জেনে নিন খুব কম সময়ে তৈরি করা যায় এমন টেস্টি আর হেলদি কয়েকটি ফ্রুট শেকের রেসিপি:

• তরমুজ এবং নারকেল স্কুইজ:
এখন বাজারে প্রচুর তরমুজ পাওয়া যাচ্ছে। গরমে তরমুজ মানেই , ঠাণ্ডা -ঠাণ্ডা অনুভূতি। তরমুজের টুকরো নিন দেড় কাপ, নারকেল কুচি আধা কাপ, অল্প ক্রিম, স্বাদমতো চিনি ও অল্প বরফের কুচি মিশিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। সামান্য লেবুর রস দিয়ে পরিবেশন করুন।

• মিক্সট ফ্রুট শেক:
কাঁচা আম ও আঙুর ফ্রিজে রেখে ঠাণ্ডা করে নিন। এবার পছন্দমতো পানি এবং চিনি দিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। পরিবেশনের সময় সামান্য জিড়ার গুঁড়া ছিটিয়ে গ্লাসের কোনায় এক টুকরো লেবু জড়িয়ে দিন। ওপরে কিছু বরফ কুচিও দিতে পারেন।

• আনারস লেমনেড:
টুকরো করা আনারস দু"কাপ, লেবুর রস এক টেবিল চামচ, অল্প বিট লবণ দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে ব্লেন্ডারে, বরফ কুচি দিয়ে পরিবেশন করতে হবে আনারস লেমনেড।